বাংলা লোকসঙ্গীতে লোকজগৎ
ও
লোকমানস

ড. চিত্তরঞ্জন মাইতি

পরিবেশক

বুকফ্রেণ্ড
৮/১/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মাতৃ প্রকাশনী
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
রাসপূর্ণিমা—১৩৯৯

প্রচ্ছদ পরিচিতি :
লোক আলপনা ও পুরুলিয়ার মুখোশ চিত্র

পরিকল্পনা :
ঝর্ণা মাইতি

রূপায়ণে :
পার্থ পাল

প্রকাশক :
সুমন প্রকাশন
অমলেন্দু মণ্ডল
১৬০ মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
পাঁচু গোপাল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রেস
৭/৯বি/২, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্যা মা
যাঁর কাছে আমার লোকসংস্কৃতির হাতেখড়ি
—সাবিত্রীরাণী মাইতির
করকমলে।

সূচীপত্র

পরিচায়িকা

এখন থেকে প্রায় চার দশক পূর্বে যখন আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের ছাত্ররূপে প্রয়াত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতি (Folklore) বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি এবং মূলতঃ তাঁরই প্রেরণায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষ পত্ররূপে লোকসংস্কৃতিকে গ্রহণ করি, তখন এই বিষয়টির গবেষণা, এই বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনার সম্ভাবনা কিংবা সাংস্কৃতিক জগতে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। আমরা যারা প্রয়াত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করেছিলাম, তাদের সকলেরই যে বিষয়টির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল এমন নয়, মোটামুটিভাবে অন্যান্য বিশেষ পত্রগুলির তুলনায় এই অর্বাচীন বিষয়টির অভিনবত্ব, এই বিষয়টি গ্রহণের সুবাদে ক্ষেত্রসমীক্ষার সুযোগলাভ (Field work) এবং সর্বোপরি অধিক সংখ্যক গ্রন্থাদি পাঠের তাড়না থেকে মুক্তিলাভের সুযোগ আমাদের সকলকে না হোক অনেককেই লোকসংস্কৃতিকে বিশেষ পত্রের বিষয়রূপে নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে তখন লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত গ্রন্থাদির সংখ্যা, বিশেষতঃ বাংলায় ছিল একান্ত-ভাবেই সীমিত।

কিন্তু এই চারদশক সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন ঘটে গেছে সুদূর প্রসারী। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে বিশেষ পত্র রূপে লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন চলছে এবং এই বিষয়ে মনোযোগী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো স্নাতক পর্যায়েও (সাম্মানিক বাংলা) লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন আবশ্যিক হয়েছে। কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে লোকসংস্কৃতির পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বিভাগেরই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বেশ কিছু গবেষক লোকসংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন

এবং অনেক গবেষক এতদ্‌বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। বেশ কিছু গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক একটি কোষ গ্রন্থও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। লোকসংস্কৃতিকে উপজীব্য করে একাধিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ এখন এক সাধারণ ঘটনা। প্রায় প্রতিটি জেলাতেই লোকসংস্কৃতির চর্চা, সংগ্রহ ও গবেষণার কেন্দ্র বেসরকারী প্রয়াসেই স্থাপিত হয়েছে। সরকারী প্রয়াসও যুক্ত হয়েছে লোকসংস্কৃতির চর্চা ও এর উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের 'বাংলা একাডেমী'ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংগ্রহ ও গবেষণা গ্রন্থাদি প্রকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লোকসংস্কৃতি চর্চাকে কেন্দ্র করে দুই বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ্‌ ও লোকসংস্কৃতি প্রেমিকদের মধ্যে এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলিও লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির নিয়মিত আয়োজন করে চলেছেন, অথবা লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধাদি প্রকাশ করছেন। নানা স্থানেই এখন 'লোক উৎসব' আয়োজিত হচ্ছে, লোকশিল্পীদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব দূরীভূত হয়েছে, আয়োজিত হচ্ছে লোকসংস্কৃতি কেন্দ্রিক নানা আলোচনাচক্র। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আঙ্গিনায় বর্তমানে লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাদির এখন গুরুত্বপূর্ণ স্থান। লোকসঙ্গীত নিয়ে বহু সংস্থাই ক্যাসেট প্রকাশ করছেন। লোকসঙ্গীত শিল্পীরা এখন আর জনারণ্যে হারিয়ে যান না, আগের তুলনায় এখন কম বেশি তাঁরা রসিক মানুষের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছেন। মোদ্দা কথা হল ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ তথা এর পুনরুজ্জীবনের জন্য যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন, আচার্য দীনেশ-চন্দ্র সেন, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের প্রয়াসে বর্তমানে তা সুনির্দিষ্ট একটি রূপ নিয়েছে। বিষয় হিসাবে লোক-সংস্কৃতি এখন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, আর তারই অভিব্যক্তি ঘটছে লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা গ্রন্থাদির রচনা ও প্রকাশে। এতগুলি কথা বলতে হল যে গ্রন্থটির প্রকাশকে উপলক্ষ্য করে, সেটি হল 'বাংলা লোকসঙ্গীতে লোকজগৎ' শীর্ষক একটি অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যেটি ইতিমধ্যেই পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েছে; এই অভিসন্দর্ভটির রচয়িতা অনুজপ্রতিম ডক্টর চিত্তরঞ্জন মাইতি।

শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন তরুণ শিক্ষাবিদ্, নিছক একটি ডিগ্রী লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি গবেষণায় মনোনিবেশ করেননি, মেদিনীপুর জেলার সাহড়দা গ্রামের বাসিন্দা তিনি, তাই কর্ণের কবচ কুণ্ডলের মতোই তিনি আজন্ম লোকসংস্কৃতির আবহাওয়ায় মানুষ। বিষয় হিসেবে লোক-সংস্কৃতিকে ভালবেসেই এই বিষয়ে তাঁর গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়া। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক রূপে লাভ করেছিলেন। গুরু শিষ্যের সম্মিলিত প্রয়াসের এক সার্থক ফলশ্রুতি রূপে বর্তমান অভিসন্দর্ভটিকে যদি অভিহিত করি, বোধকরি আতিশয্য দোষ ঘটবে না।

লোকসংস্কৃতি গবেষণার প্রথমদিকের অভিসন্দর্ভগুলিকে মূলতঃ সংগ্রহ রূপেই আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। সেগুলি আকৃতিতে হ'ত বিশালাকার আর প্রকৃতিতে হ'ত প্রায় বিশ্লেষণরহিত। কিন্তু সম্প্রতি এই ধারার পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইদানীং লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত অভিসন্দর্ভগুলি সংগ্রহ বা সংকলনের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকছে না, গবেষকগণ তার চরিত্র ও আঙ্গিক বিশ্লেষণেই অধিক তৎপরতা দেখাচ্ছেন। সেইটিই প্রত্যাশিত। বর্তমান বক্ষ্যমান গ্রন্থের ক্ষেত্রেও শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন মূলতঃ বাংলার লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাতেই তাঁর গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, যদিও গ্রন্থের ২য় খণ্ডে টুসু, ভাদু, ঝুমুর ইত্যাদি পর্যায়ের ১৬৮টি নিজস্ব সংগ্রহ সংকলিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রধান গুরুত্ব কিন্তু এর ১ম খণ্ডটির জন্যই। মোট আটটি সুলিখিত অধ্যায়ে লেখক লোকসঙ্গীতের উৎপত্তি ও বঙ্গীয় শ্রেণী বিন্যাস সহ লোকবিশ্বাস, সংস্কার, যাদু, লোকাচার, লৌকিক দেবদেবী, সমাজ ও পরিবারের নানা চরিত্র, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ প্রকৃতি ইত্যাদি কেন্দ্রিক সঙ্গীতগুলির বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন, মূলতঃ তুলনামূলক ও নৃতাত্ত্বিক এই দুটি স্বীকৃত পদ্ধতির সহায়তায়। ফলে তাঁর আলোচনা বহুমুখীনতা প্রাপ্ত হয়েছে, অথচ গ্রন্থের অবয়ব বীভৎস ভাবে স্ফীতাকার হয়নি। শুধু লোক-সংস্কৃতি অনুরাগী পাঠকদেরই এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করবে না, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাঁরা জানতে উৎসুক এবং পাথুরে প্রমাণের জন্য যাঁরা অনড়, তাঁরাও তৃপ্ত হবেন উপযুক্ত তথ্যাদি লাভ করে এই গ্রন্থ থেকে।

গ্রন্থটির বড় গুণ, অন্ততঃ বর্তমান পরিচায়িকা রচয়িতার কাছে যা মনে হয়েছে, লেখক নিছক তথ্যের সমাহার ঘটাননি, সংগৃহীত তথ্যগুলির বিচার বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন, আর তাই পুনরাবৃত্তি দোষকে সহজে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

বিষয় ও আলোচনার গুণেই গ্রন্থটি রসিক পাঠক মহলে সমাদৃত হবে এ বিশ্বাস বর্তমান পরিচায়িকা রচয়িতা দৃঢ়ভাবে পোষণ করে।

প্রথম খণ্ড

প্রাক কথন

বাংলা লোকসঙ্গীত বাঙালীর জীবনের দর্পণ—বাঙালীর সমাজ ও জগতের দর্পণ। এই সঙ্গীতের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে তার বর্তমান ও অতীত জীবন চর্চার ইতিহাস। লোকসঙ্গীতে মুখে মুখে ভাষা পরিবর্ত্তিত হলেও—মানসিকতা-চেতনা-ভাবনা থাকে অপরিবর্ত্তিত। তাই লোকসঙ্গীতের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস—তার সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্মীয়চিন্তা ভাবনা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির অন্বেষণ সম্ভব।

বাঙালী আমোদ প্রিয়। বাংলা প্রবাদে তার প্রমাণ আছে ঃ বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ। বাঙালী সঙ্গীত প্রিয়। বাংলা লিখিত সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাগীতি, বড়ু কবির শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যযুগ অতিক্রম করে সতের শতকের আলাওল ইত্যাদি পর্যন্ত বাঙালীর সঙ্গীত চর্চা ও সঙ্গীত প্রীতির স্বাক্ষর। বাঙালীর লিখিত সাহিত্যের মধ্যে যেমন সুদীর্ঘ সঙ্গীত পরিক্রমা, মৌখিক প্রচলিত লোকসঙ্গীতেও তার জীবন ও জগতের সমগ্র নিদর্শন। বর্তমান কালেও বাঙালীর প্রায় প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানের আরম্ভ ও সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই হয়।

প্রশ্ন হোল লোকসঙ্গীত বলতে কি বোঝায়? লোকসঙ্গীত মূলতঃ গ্রাম্য নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত লোকের মৌখিক সৃষ্টি—যার মধ্যে ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা গোষ্ঠীর অধিকার—চিন্তাভাবনা, বিকশিত হয় অধিক। ফলে তা হয়ে ওঠে সার্ব্বজনীন। লোকসঙ্গীত রচয়িতার নাম হারিয়ে, হয়ে ওঠে একটি গোষ্ঠীর সম্পদ। এমন কি ব্যক্তি নামে পরিচিত লোকসঙ্গীত ও ব্যক্তির না থেকে গোষ্ঠীর বা সংহত সমাজের সম্পদ হয়ে ওঠে। পরম্পরানুক্রমে এই সামাজিক সম্পদ উত্তরকালের হাতে হস্তান্তরিত হয়। লোকসঙ্গীতের মৃত্যু নেই—বিকাশ আছে। এই চিরন্তন স্রোত

নানা মানুষের মুখে নানান আঞ্চলিক ভাষায় প্রবাহিত হয়ে জীবন ও জীবিকার এবং জগতের ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলে। লোকসঙ্গীতের প্রকাশ সহজ এবং স্বাভাবিক। এর সুরের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকে না। ব্যবহারিক জীবনের ক্লান্ত অবসবে কিংবা অবসর বিনোদনের মুহূর্তে অথবা নিবিড় আবেগময় ক্ষণে লোকসঙ্গীতের অনাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ। প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, লাভ ক্ষতি, আচার অনুষ্ঠান সব কিছুই লোক-সঙ্গীতের বাণীর মধ্যে ধরা পড়ে।

লোকসঙ্গীতের জন্ম কবে এবং কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানান বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন গবেষকের মতামতগুলি নিম্নরূপ।

১. লোকনৃত্য থেকে লোকসঙ্গীতের জন্ম। ভাষা সৃষ্টির পূর্বে মানুষ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে ভাব প্রকাশ করত। আনন্দ অনুভূতির প্রকাশ করত ঘাড়, কোমর, পা, হাত ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে নেড়ে। এইভাবেই কালক্রমে লোকনৃত্যের জন্ম। ফ্রান্সের আলতামিরা ও জার্মানীর ম্যানভালেনিয়ান গুহায় মানুষের আঁকা নানান নৃত্য ভঙ্গিমার ছবি পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ নিয়ানডারথাল যুগের মানুষ এগুলি এঁকেছিল। এ ছবিগুলি প্রমান করে তখন সমাজে লোকনৃত্য প্রচলিত ছিল। এরপর অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে ভাবসাদৃশ্য রেখে, ভাষা প্রয়োগ করে, আরও পরে সুর প্রয়োগ করেই সম্ভবতঃ লোক-সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে।

২. প্রাচীন মানুষ যখন যৌথভাবে কোন ভারী জিনিষ টেনে নিয়ে যেত—তখন শ্রম লাঘব করার জন্য বিশেষ সুর সহযোগে লোকসঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল।

৩. সঙ্গীতের সুরের মধ্যকার "যাদু" দিয়ে দেবতাকে কিংবা অপদেবতাকে অথবা অলৌকিক কোন শক্তিকে বশ করা যাবে এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে আদিম মানব লোকসঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল।

৪. আদিম প্রপিতামহগণ যখন শিকার করতে যেতেন তখন পাখীর ডাক—কিংবা বন্যপ্রাণীব ডাক অনুকরণ করে শিকারকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতেন এই অনুকরণ প্রচেষ্টা থেকে লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

৫. শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য আবেগবহুল ভাবে নানা কথা টেনে টেনে বলতে বলতে লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

৬. স্বাভাবিক হৃদয় অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আদিম মানুষ লোকসঙ্গীতের জন্ম দিয়েছে।

৭. যৌন জীবনেব ছোঁয়ায় লোকসঙ্গীতের জন্ম।

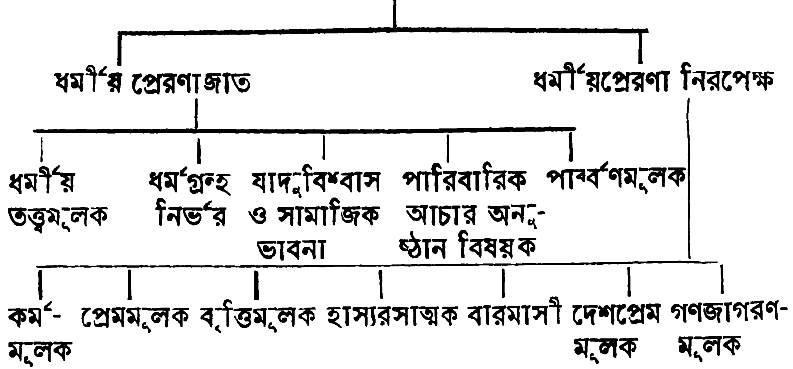
৮. দূর থেকে হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, রোদন ইত্যাদি থেকে সুর ও ক্রমান্বয়ে লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

৯. ছন্দ বা তালের উৎপত্তি থেকে লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

এই মতগুলি কিন্তু লোকসঙ্গীতের উদ্ভব সম্পর্কে শেষ কথা নয়। সুনিশ্চিতভাবে শেষ কথা বলাও কঠিন। তবে এই মতগুলি লোক-সঙ্গীতের জন্মের বিভিন্ন স্তরের প্রতি আমাদের ইঙ্গিত করে। লোকনৃত্য, পাখীর ডাক অনুকরণ, সঙ্গীতের যাদু শক্তি, দূর থেকে আহ্বান, রোদন ইত্যাদি, স্বাভাবিক হৃদয় অনুভূতির প্রকাশ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মিশ্রিত প্রচেষ্টায় ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের জন্ম হয়েছে।

লোকসঙ্গীতের শ্রেণী বিন্যাস

বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন ভাবে লোকসঙ্গীতের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। প্রকৃত অর্থে বাংলা লোকসঙ্গীত দুটি সমান্তরাল ধারায় পুষ্ট হওয়ার চেষ্টা করেছে। একটি ধারায় ধর্মের প্রভাব, অন্য ধারাটিতে ধর্মীয় প্রভাব হীনতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা লোকসঙ্গীতগুলিকে নিম্নলিখিত-ভাবে বিন্যস্ত করা যায়।



লোকসঙ্গীত পরিচয়

ধর্মীয় তত্ত্ব	ঃ বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, মাইজ ভাণ্ডারী ইত্যাদি।
ধর্মগ্রন্থ নির্ভর	ঃ ভারতগান (মহাভারত অবলম্বনে), বালুল-গীতি (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত), বেনাকুশান (রামায়ণ), কাঠিনাচের কিছু গান (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত) ইত্যাদি।
যাদুবিশ্বাস ও সামাজিক ভাবনামূলক	ঃ বেঙবিয়া, হুদুম দেওয়ার, ক্ষেতবন্ধন, ধান্যরোপণ, ভাদু, টুসু ইত্যাদি।
পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান মূলক	ঃ ভাইফোঁটা, বিবাহ, সাধভক্ষন ইত্যাদি।
পার্ব্বন মূলক	ঃ করম, ঈদ, জারী।
কর্মমূলক	ঃ ধানভানা, পাটকাটা, ছাদপেটা, তাঁতবোনা, ভার তোলা, গাছ গড়ানো, সারি।
প্রেমমূলক	ঃ ভাটিয়ালী, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, মইষাল বন্ধু ইত্যাদি।

বৃত্তিমূলক	ঃ	সাপুড়ে, পটুয়া, বানরনাচ, হিজড়ের গান ইত্যাদি।
হাস্যরসাত্মক	ঃ	হাবু, সঙের গান, হাসির গান ইত্যাদি।
বারমাসী গান	ঃ	বারাষে, বারমাস্যা ইত্যাদি।
দেশপ্রেমমূলক	ঃ	স্বদেশী গান, চরকার গান ইত্যাদি।
গণজাগরণ মূলক	ঃ	নানা রাজনৈতিক চেতনার গান, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিরোধী ইত্যাদি।

লোকসঙ্গীত ও লোকজগৎ

নৃ-বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন ভারতে মোট ছ'টি শ্রেণীর মানব গোষ্ঠী বাস করেছিল। সেগুলি হোল—(১) নিগ্রিটু (২) প্রোটো অস্ট্রালয়েড (৩) মেডিটেরানিয়ান (৪) ওয়েষ্টার্ন ব্রাচি কপালস্ (cephalus) (৫) নার্ডিক (৬) মঙ্গোলয়েড। এই মানব গোষ্ঠীর ধ্যান ধারণা—অ্যানিমিজম, ম্যাজিক, টোটেম, টাবু, মানা (mana) ও ফেতিস (fetish) মিশে গেছে বাঙলা ভাষাভাষীদের মধ্যে। তাছাড়া পরবর্তীকালে পাঠান, মোঘল, তুর্কী, ফরাসী ইংরেজ, বৌদ্ধ ইত্যাদি সংস্কৃতি মিশে গেছে বাঙালীদের সংস্কৃতির সঙ্গে। ঐ মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে পশু ও প্রাণীজগৎ, প্রকৃতিজগৎ এবং এদেরকে প্রভাবিত করে যে সৌরজগৎ তার প্রভাব। এ সমস্ত কিছু নিয়েই লোকজগৎ, লোকজগৎ মানুষের মনকে সংগঠিত করে, মানুষের চেতনায় যে সঙ্গীতের জন্ম—তার অন্তরালে থাকে তার লোকজগতের প্রভাব। বর্তমান গবেষণায় অন্বেষণ করতে হবে লোকসঙ্গীতে লোকজগতের প্রভাব কতখানি।

যেহেতু বাঙালী সহজভাবে গানের মধ্যে তার আচার আচরণ, সংস্কৃতি-লোকজগতের প্রভাবকে প্রকাশ করেছে—সেইহেতু এই গবেষণায় বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় একটি ধারাও প্রকাশ করা সম্ভব। জাতিতত্ত্বের দিক থেকে এই ধারার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের অন্বেষণের পথ সাংস্কৃতিক—নৃ-তাত্ত্বিক। লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে কোন আলোচনা আমরা করছি না। সুর থেকে সংস্কৃতির কোন ধারাস্রোত বেরিয়ে আসবে বলে আমরা মনে করিনা। বরং এ ব্যাপারে লোকসঙ্গীতের কথা বা বাণীই আমাদের একমাত্র সহায়ক—যা থেকে বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় পথটি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আলোচনার সুবিধার জন্য মূল বিষয়কে নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে—

১. লোকসঙ্গীতে লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও যাদু।

২. লোকসঙ্গীত ও লোকাচার।

৩. লোকসঙ্গীতে লৌকিক দেবদেবী।

৪. লোকসঙ্গীতে লোকসমাজ ও পরিবারের বিভিন্ন চরিত্র।

৫. লোকসঙ্গীতে জীবজন্তু পাখী-পতঙ্গ।

৬. লোকসঙ্গীতে সৌরজগৎ ও প্রকৃতি।

৭. গণজাগরণমূলক লোকসঙ্গীত।

৮. লোকসঙ্গীতে উপমা ও চিত্রকল্প।

প্রথম অধ্যায়

লোকসঙ্গীতে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও যাদু

লোকসংস্কার, বিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাস সমাজে কবে থেকে প্রচলিত হোল এ কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। সমগ্র মানব সমাজ কোথাও মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই লোকসংস্কার বা লোকবিশ্বাসের কিংবা যাদুবিশ্বাসের সৃষ্টি করেনি। পৃথিবীতে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে করতে, এক এক মানব গোষ্ঠী এক এক রকম লোক-সংস্কার, লোকবিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে তাই এই লোকসংস্কার বিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাসের সামান্য মিলও থাকতে পারে। লোকসংস্কারের উৎপত্তি সম্পর্কে জেমস্ ফ্রেজার ও এডওয়ার্ড টাইলর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। উৎস যাই হোক সমাজে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। লোকসঙ্গীতেও তার প্রভাব পড়েছে। আমরা লোকসঙ্গীতে লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও যাদুবিশ্বাসের স্বরূপ আলোচনা করব।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে উঁকি মারে তা হোল লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার বলতে আমরা কি বুঝি? এ ব্যাপারে পণ্ডিত গবেষকদের মধ্যে নানান বিতর্ক রয়েছে। ডঃ ওয়াকিল আহমদ তাঁর বাংলার লোকসংস্কৃতি গ্রন্থে বলেছেন—"বিশ্বাস মনোজ। বস্তু বা বিষয়গুণের ধারণা থেকে বিশ্বাসের জন্ম হয়*** মনের আকাশে কতক বিশ্বাস অদৃশ্য ধূলিকণার ন্যায় তরল অবস্থায় ভেসে বেড়ায়, সেগুলি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কতক লোকবিশ্বাস মানুষের আচার আচরণ দ্বারা সমর্থিত জীবনযাত্রার পথে স্থায়ী ও প্রথাগত স্বীকৃতি লাভ করে** আচরণ সিদ্ধ, প্রথাবদ্ধ বিশ্বাসের এ স্তরকে আমরা সংস্কার নাম দিতে পারি।" ১

আবার ডঃ হাফিজ বলেন—"একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষণ তা লোকবিশ্বাসই বটে। কিন্তু যে

মুহূর্তে তা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, যূথবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপে যখন যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে তখন তা পরিণত হয় লোকসংস্কারে।" ২

উভয়ের বক্তব্যে লোকবিশ্বাস কথাটি ঠিক পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না, কিন্তু লোকসংস্কারের সংজ্ঞা উভয়েই গ্রহণযোগ্য ভাবে দিয়েছেন। উভয় উদ্ধৃতিতে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে। প্রথমে যখন ব্যক্তিগত বিশ্বাস সার্বজনীনতা অর্জন করেই গোষ্ঠীর মনে স্থান করে নেয় তখনই তা হয়ে ওঠে লোকবিশ্বাস। আবার ডঃ হাফিজের বক্তব্যে লোকবিশ্বাস যে শুধু "নিরক্ষর ব্যক্তির মনে" স্থান পায় বলা হয়েছে—এটিকে ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। বিশ্বাসের সঙ্গে তর্কের কোন স্থান নেই—সেই সূত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোন স্থান নেই। বিশ্বাস—বিশ্বাসই। বর্তমানে বহু শিক্ষিত মানুষকে তাবিজ ধারণ করতে দেখা যায়—ডাইনী তন্ত্রে, মন্ত্র তন্ত্রে পূর্ণ আস্থা রাখতেও দেখা যায়। বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক বড কথা নয়। বড় কথা হোল বিচার বিশ্লেষণ না করে মেনে নেওয়া। এই অবস্থায় শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রশ্ন না তোলাই ভাল।

একজন লোকসংস্কৃতিবিদ লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের একটি গ্রহণ যোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাঁর "লোকবিশ্বাস ও সংস্কার" ৩ গ্রন্থে। সেই সংজ্ঞা স্মরণে রেখে মোটামুটি ভাবে বলা যায়—বিশেষ জনমণ্ডলী যখন কোন বিশেষ চিন্তা, আচার অনুষ্ঠান শুভ বা অশুভ বোধে মেনে চলা উচিত বা অনুচিত বলে বিশ্বাস করে তখন তাকে বলা যেতে পারে লোকবিশ্বাস।

এই লোকবিশ্বাস যখন ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী করা হয় তখন তা হয়ে ওঠে লোকসংস্কার। প্রতিটি লোকসংস্কারের অন্তরালে আছে অশুভ চিন্তা। পাছে ঐ সংস্কার পালন না করলে মানুষের ক্ষতি হবে, এই আশঙ্কায় লোকসংস্কারের আচার অনুষ্ঠানগুলি সে পালন করে।

আদিম লোকসমাজ মনে করত সমস্ত অমঙ্গল ঘটায় কোন অলৌকিক শক্তি। সে দেবতা হতে পারে কিংবা অপদেবতা ভূত প্রেত ইত্যাদি অশরীরী আত্মাও হতে পারে। এই অলৌকিক ক্ষমতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ যাদু শক্তির প্রয়োগ করতে শুরু করল।

যাদুবিদ্যা সম্পর্কে পূর্বতন গবেষকদের ধারণা ঃ

যাদুবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হোল জীবনে চলার পথে পরাজিত ভীত, বিমূঢ়, দুর্বল মানুষকে আপাততঃ সাহস ও শক্তি যোগান। রুথ বেনেডিকট্‌ যাদু বিদ্যাকে একটি মূল্যবান মানবিক অবলম্বন বলে মনে করেন, যা মারাত্মক অবদমনকে প্রতিহত করে সমাজের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ৪

ফ্রয়েড যাদু বিদ্যাকে সর্বপ্রাণবাদের কলাকৌশল (Technique) বলে অভিহিত করেছেন। ৫

যাদু বিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কে ফ্রয়েডের বক্তব্য হোল যাদুবিদ্যা বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, এ বিদ্যা অবশ্যই মানুষকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে এবং এ বিদ্যা অবশ্যই শত্রুকে আঘাত হানার শক্তি মানুষকে দেয়।

"সমগ্র যাদু বিদ্যা হোল অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বাধ্য করে নিজের কাজে লাগাবার জন্য একটি পদ্ধতি মাত্র। ৬

ধর্ম এবং যাদুবিদ্যা সর্বপ্রাণবাদ থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও যাদুর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ধর্মের সাহায্যে প্রার্থনা করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা হয় কিন্তু যাদুর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোর করে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বশ করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

যাদুর সংজ্ঞা ঃ

পূর্বোক্ত গবেষকদের সঙ্গে এক মত হয়ে বলা যায়—অলৌকিক ভাবে কোন কিছুকে আলোড়িত করা, আয়ত্ত করা কিংবা প্রভাবিত করাকে বলে যাদু।

অতীত যুগে যাদু :

যাদু বিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবতঃ প্রত্ন প্রস্তর যুগে। এই সময়ে মানুষ যাযাবর ছিল। তখনও পরিবার গড়ে ওঠেনি। তুষার যুগের জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলছিল। প্রচণ্ড শীতের জন্য নদীর অববাহিকা ছেড়ে মানুষ হয়ে উঠল গুহাবাসী। পশু এবং শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখল। মাংস পুড়িয়ে খাওয়া আরম্ভ করল। এই সময় ভ্রূণ ভঙ্গিমায় কবর দেওয়ার পদ্ধতিও

তারা শুরু করেছিল। এর থেকে মনে হয় তারা পরকাল তত্ত্ব সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিল। তৎকালীন মানুষের মনের ভাব ধরা পড়েছে নানান গুহাচিত্রে ও আয়ুধ চিত্রে। অস্ত্রের মধ্যে নানান পশু-পাখীর চিত্র চিত্রিত করেছিল তারা। অস্ত্রের উপর তারা যে পশু-পাখীর ছবি আঁকত এগুলিকে সদৃশ যাদু বলেই মনে হয়। সম্ভবতঃ তারা বিশ্বাস করত অস্ত্রে যে পশু বা পাখীর ছবি আঁকা হবে সেই অস্ত্র সঙ্গে থাকলে সহজে উক্ত পশু বা পাখীর সন্ধান পাওয়া যাবে এবং তা শিকার করা যাবে।

আদিম স্তরে যাদুর প্রয়োগ ঘটানো হোত বিভিন্ন প্রয়োজনে—

(১) প্রকৃতিকে বশে আনার জন্য—যেমন—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষারপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি রোধে যাদুর ব্যবহার।

(২) বিভিন্ন ভয়ভীতিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য যাদুর ব্যবহার।

(৩) পশু পাখীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যাদুর ব্যবহার।

নৃ-বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন সমুদ্রের তলায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া আটলাণ্টিসে যাদুবিদ্যার চর্চা হোত। তাঁরা নিশ্চিত যে প্যালিওলিথিক যুগের গুহাচিত্রে যাদুবিদ্যার প্রমাণ লুকিয়ে আছে। তাছাড়া আপার প্যালিওলিথিক যুগে ফ্রান্সের ট্রোরিস-ফ্রেরিশ গুহায় চিত্রিত "শৃঙ্গ সমন্বিত হরিণের মুখোশ পরিহিত" মানুষের চিত্রটি যাদুবিদ্যার প্রমাণ।

প্রাচীন ভারতীয় যাদু তন্ত্রে যাদুর ব্যবহারিক প্রয়োগ :

প্রাচীন ভারতীয় যাদুতন্ত্রে ছ'টি প্রয়োজনে যাদুবিদ্যার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এক : শান্তিকর্ম।
এই প্রয়োগের দ্বারা রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার চেষ্টা এবং বিরুদ্ধ গ্রহাদির তুষ্টি বিধান করা হয়।

দুই : বশীকরণ।
এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীকে আপন বশে রাখার চেষ্টা করা হয়।

তিন ঃ স্তম্ভন।
এর সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণীর প্রবৃত্তিকে রোধ করা যায়।

চার ঃ বিদ্বেষণ।
এই পদ্ধতির দ্বারা প্রাণীর ভালবাসা ধ্বংস করে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ আনার চেষ্টা করা হয়।

পাঁচ ঃ উচ্চাটন।
এই পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন প্রাণীকে বিতাড়িত বা উৎখাত করা যায়।

ছয় ঃ মারণ।
এর দ্বারা যে কোন প্রাণীকে ধ্বংস করা যায়।

যাদুর শ্রেণী বিভাগ ঃ

শ্রেণীগত দিক থেকে যাদুকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ শুক্ল যাদু (White Magic) এবং দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ যাদু (Black Magic)।

শুক্ল যাদু ঃ যে যাদুর সাহায্যে সমাজের বা গোষ্ঠীর উপকারের চেষ্টা করা হয় তাকে বলে শুক্ল যাদু। উদাহরণ স্বরূপ—বৃষ্টি-কামনা, শিলাবৃষ্টি রোধ, গ্রহ তুষ্টি বিধান, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ যাদু ঃ যখন যাদুর সাহায্যে গোষ্ঠীর বা জনসাধারণের ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয় তখন তাকে বলা হয় কৃষ্ণ যাদু। যেমন—ব্যাধি দীর্ঘস্থায়ী করা, মানুষকে বাণ মেরে পঙ্গু করে দেওয়া, বশীকরণ, বৃক্ষকে মেরে ফেলা ইত্যাদি।

ফ্রেজারই যাদু বিদ্যাকে সুচিন্তিত ভাবে বিভক্ত করেছেন। তাঁর অনুসরণে নিম্নলিখিত ভাবে যাদুবিদ্যাকে বিভক্ত করা যায়।

তত্ত্বগত যাদু ঃ যে যাদুর মধ্য দিয়ে লাভ ক্ষতি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং যাদু বিষয়ক নিয়মাবলী জানা যায় তাকে বলে তত্ত্বগত যাদু (থিয়োরিটিক্যাল ম্যাজিক)।

ব্যবহারিক যাদু ঃ নিজের বা সমাজের প্রয়োজনে যে নিয়ম বা পদ্ধতি প্রয়োগ করে মানুষ অতি প্রাকৃতকে বশ করার চেষ্টা করে তাকে বলে ব্যবহারিক যাদু (প্র্যাকটিক্যাল ম্যাজিক)। ব্যবহারিক যাদুকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হ্যাঁ সূচক এবং না সূচক।

হ্যাঁ সূচক ঃ এই যাদুর মধ্যে পড়ে বিবিধ প্রয়োজনে নানান ঐন্দ্রজালিক প্রয়োগ জনিত ক্রিয়াকর্ম।

না সূচক ঃ ধর্মীয় অনুশাসন ও ট্যাবু জনিত আচার-আচরণগুলি না ধর্মী যাদুর অন্তর্গত।

হ্যাঁ সূচক যাদুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ সদৃশ যাদুবিদ্যা (হোমিওপ্যাথি ম্যাজিক), দ্বিতীয়তঃ যোজক যাদু বিদ্যা।

সদৃশ যাদু ঃ সদৃশ যাদু সম্পর্কে ফ্রেজারের মত হোল সদৃশ ঘটনা ফলাফল সৃষ্টি করে (লাইক প্রডাকটস্ লাইক) এই প্রক্রিয়ায় মানুষ সামনে একটি নকল কিছু রেখে অনুরূপ আসল বস্তু কামনা করে।

যোজক যাদু বা সংযুক্ত-কারী যাদু ঃ মনে করা হয় ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তু, পোষাক কিংবা দেহের নখ চুল ইত্যাদি দেহ থেকে যতদূরে নিয়ে যাওয়া যাক না কেন দেহের সঙ্গে তার অলৌকিক যোগ থাকে ফলে, ঐ সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করে ঐ বস্তুতে যেমন অত্যাচার করা হয় আসল ব্যক্তির শরীরেও সেই অত্যাচারের নিদর্শন ফুটে ওঠে। এই পদ্ধতিতে কারও চুল নিয়ে গরম জলে ফুটান হলে উক্ত চুলের প্রকৃত মালিক ও অসহ্য যন্ত্রণা পাবে।

আমাদের আলোচনা লোকসঙ্গীতে লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস নিয়ে। যে সমস্ত সঙ্গীতে যাদু প্রসঙ্গ আছে সেগুলিই এখানে আলোচিত হচ্ছে। যাদু প্রসঙ্গ হীন লোকবিশ্বাস ও লোক-সংস্কারগুলি এখানে অনালোচিত থাকছে।

বিবাহ সঙ্গীতে লোকবিশ্বাস—লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস :

বিবাহের সঙ্গীতে নানান আচার অনুষ্ঠানে নানান লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। রাজসাহী অঞ্চলে মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ সঙ্গীতের আচারে যাদুর প্রসঙ্গটি লক্ষ্যণীয়। একটি গানে ছেলে যাচ্ছে বউ আনতে। মায়ের আশঙ্কা পথে কোন অপদেবতার বা গুণীনের (ম্যাজিসিয়ান) কু-দৃষ্টি যাতে না পড়ে সে জন্য ছেলের জামার পকেটে একটি রসুন রাখা হয়। তারপর গাওয়া হয় গান—

আদি বন্দলাম অনাদি বন্দলাম
বন্দলাম চাইরোদিক রে
পীর বন্দলাম পেগাম্বর বন্দলাম
মায়ের দুর্লভ পুতররে।

পকেটে রাখা রসুনটির গুণে ছেলের উপর কোন কু-দৃষ্টি কার্যকরী হবে না। এটি একটি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এবং একটি প্রতিরোধ মূলক যাদু ক্রিয়াও বটে। প্রাচীন ভারতীয় যাদুতন্ত্র অনুসারে একে শান্তিকর্ম ঘটিত যাদু প্রয়োগ বলা যায়।

বিবাহ সঙ্গীতে সন্তান কামনার লোকবিশ্বাস—লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস :

সন্তান কামনায় যাদুবিশ্বাসের প্রয়োগ পৃথিবীতে অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আছে। গবেষকেরা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের বাটক উপজাতির মধ্যে অনুসন্ধান করে একটি যাদুবিশ্বাসের প্রমাণ পেয়েছেন। সেখানে সন্তানহীনা নারী শিশুর কামনায় একটি কাঠের শিশু মূর্তি তৈরী করে কোলে বসিয়ে তাকে আদরের অভিনয় করে। বাটক উপজাতির মানুষের লোকবিশ্বাস—এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সন্তান-হীনা নারীটি সন্তানবতী হতে পারবে। ৮ এটি একটি 'সদৃশ' যাদুর উদাহরণ।

বাংলা দেশে মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ সঙ্গীতে সন্তান কামনার লোকবিশ্বাসটি প্রকাশিত হয়েছে। কোন কোন স্থানের বর বা কনের নানী দাদী ও ভাবীরা জেলেনী, মেথরাণীর সঙ সেজে নানান

অঙ্গভঙ্গী করে গান গায়। ঐ সময় কেউ কেউ একটি (বুড়ি) গামছা বা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী পুতুল বা প্লাস্টিকের পুতুল কনের কোলে দিয়ে গান গায়—

ওলো ছাওয়ালের মাও
ছাওয়াল ক্যানে কান্দে লো ?
ওলো ছাওয়ালের মাও
বাপের কোলে যাইবার লাইগ্যা
ছাওয়াল খলবল খলবল করে লো
ওলো ছাওয়ালের মাও। ৯

গানটি গাওয়ার আগে কনের কোলে যে পুতুলটি রাখা হয় তা কিন্তু বিশেষ লোকবিশ্বাসজাত। উক্ত লোকবিশ্বাসটি হোল—কনে সদ্য বিবাহিতা। পুতুল কোলে রাখলে কনের কোল আলো করে তারও একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। এই পদ্ধতিটি কালক্রমে লোক-সংস্কারে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এটি একটি সদৃশ যাদুবিশ্বাস।

আশরাফ সিদ্দিকীর মতে রাজসাহী জেলায়ও এ জাতীয় লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। সেখানেও কনের কোলে পুতুল তৈরী করে দেওয়া হয়, তারপর গাওয়া হয়—

ছাওয়াল কান্দেরে—
চাচীর কোলে যাইতে ছাওয়াল কান্দেরে।
দাদীর কোলে যাইতে ছাওয়াল—
ছলবল ছলবল করে রে……।
খলবল খলবল করে রে……।

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ

বিয়ের পরের দিন বর, কনেকে কোলে নিয়ে একটি মাটির খোলায় বা মাটির প্রদীপে পা রাখে, তখন ঐ মাটির পাত্র বা প্রদীপ যতগুলি টুকরো হয়—বিশ্বাস ঐ বর কনের ততগুলি ছেলে মেয়ে হবে। (লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ—আবদুল হাফিজ পৃঃ ১৬১) এটি একটি হ্যাঁ ধর্মী সদৃশ যাদু বিশ্বাস।

সাধভক্ষণ সঙ্গীতে লোকবিশ্বাস—লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস:

গর্ভধারিণী নারীকে পাঁচ-সাত-নয় মাসের সময়ে সাধ খাওয়ান হয়। প্রথমে একটি নতুন শাড়ী পরান হয়। তারপর গলায় মালা ও কোমরে ঘুনসী দেওয়া হয় কপালে দেওয়া হয় চন্দন। তারপর তাকে নানান খাদ্য যেমন—লুচি, পিঠা, ফল, মিষ্টি, ক্ষীর, দই ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। কোন কোন অঞ্চলে গর্ভধারিণীর চারপাশে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বসিয়ে খাওয়ান হয়। খাওয়ার পর ছেলে মেয়েরা চারদিক থেকে গর্ভধারিণীকে জড়িয়ে ধরে।

এই পদ্ধতির অন্তরালে বহু প্রাচীন লোকবিশ্বাস ক্রিয়াশীল—নতুন শিশু গর্ভধারিণীর চারপাশে জড়িয়ে ধরার অর্থ এই শিশু আরও নতুন শিশু ডেকে আনবে। ফলে গর্ভধারিণী বহু সন্তানের জননী হবে ক্রমে ক্রমে। এই লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কারটি প্রকৃত অর্থে একটি সদৃশ্য যাদু বা "হোমিওপ্যাথী" যাদু বিশ্বাস।

ময়মন সিংহ অঞ্চলে প্রচলিত সাধভক্ষণের গানটি নিম্নরূপ ঃ

একোনা মাসের কালে নীহারেতে নীলা
দুই না মাসের কালে রক্তে বান্ধে গোলা।
তিন না মাসের গো কালে ভাইটাল শরীল
চাইরিনা মাসের কালে ধরে চাইর রীত।
পঞ্চনা মাসের কালে পঞ্চফুল ফুটে
ছয়না মাসের গো কালে মায়ে তন লুটে।
সাত না মাসের গো কালে সাতলরী হার
অষ্ট না মাসের গো কালে মায়ের সন জগায়।
নয়না মাসের কালে নব গণ্ড স্থিতি
দশ না মাসের গো কালে ঐ পিঞ্জরায় বসতি। ১০

ঐ একই জাতীয় গান প্রচলিত আছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে—

এক মাসের কালে যাদু গোপনে রাখিল
দুই মাসের কালে যাদু রক্ত গোলা গোলা
তিন মাসের কালে যাদু তিনটি উদর অঙ্গুরী

চারি মাসের কালে যাদু হাড়ে মাংস জোড়া।
পাঁচ মাসের কালে যাদু পঞ্চফুলে ফুটিল
ছয় মাসের কালে যাদু উলটে পালটে রল।
সাত মাসের কালে যাদু সাতকরইয়া খায়
অষ্ট মাসের কালে যাদু অষ্ট মোকাম হয়।
নয় মাসের কালে যাদু নবদণ্ড তিথি
দশ মাসের কালে যাদু উদরে বসতি।
দশ মাস দশ দিন যেদিন পূর্ণ হইল
উহু মাহু করি যাদু কাঁদিতে লাগিল। ১১

উক্ত গানে যে "সাতকরইয়া খায়" বলা হয়েছে তা অনেকখানি সাধ ভক্ষণের রীতির মতই, তবে "সাতকরইয়া"তে সাত রকমের দানা—যথা —বাদাম, তিসি, চাল, শিশুদানা ইত্যাদি খাওয়ান হয়। এই গানগুলিতে গর্ভস্থ সন্তানের আকৃতির বর্ণনা করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয় গর্ভবতী রমণীর সন্তানও মাসে মাসে অনুরূপভাবে পুষ্ট হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠবে। আসলে এগুলি "সমপ্রক্রিয়া যাদু" বিশ্বাস।

বৃষ্টি আবাহনের সঙ্গীতে লোকবিশ্বাস-লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস ঃ

কৃষিভিত্তিক সমাজে বৃষ্টি একান্তই কাম্য। বৃষ্টি না হলে জীবন বাঁচে না। বৃষ্টি আসে আকাশ থেকে। মানুষের সমস্ত ক্ষমতার বাইরে থেকে আসে বৃষ্টি। তাই মানুষ প্রার্থনা জানায় দেবতার কাছে—কামনা করে বৃষ্টির। কোথাও নাচের মধ্য দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কোথাও আল্পনার দ্বারা দেবতাকে খুশী করার চেষ্টা। কোথাও গান, ছড়া, ব্রত লোকাচার দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বৃষ্টি কামনা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্র দিয়ে দেবতাকে বশ করে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করা হয়।

"প্রাচীন টিউটনেরা নগ্ন বালিকার গায়ে পানি ঢেলে বৃষ্টি আবাহন করত। গ্রীকরা ওক গাছের ডাল পানিতে ডুবিয়ে মেঘ দেবতার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। ভারতের বৌদ্ধরা মন্দির প্রাঙ্গণে গর্তে পানি ঢেলে মাটির শোষণের প্রতীকে বৃষ্টি কামনা করত।" ১২

জর্জ ফ্রেজার তথ্য সংগ্রহ করে বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীন থঙ্গ। বা বাণ্টু জাতির নারীগণ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নাচত এবং বৃষ্টি আবাহন মূলক গান গাইত।

অনুরূপ একটি লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার দেখা যায় রাজবংশীদের হুদুমা ব্রত এবং ইটা ব্রতের মধ্যে। রাজবংশীদের ইটা ব্রতে অমাবস্যা রাত্রির মত নিকষ কালো একটি মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে অকর্ষিত ভূমির উপর অমাবস্যা তিথিতে নাচ গান করে বৃষ্টি কামনায়। নির্বাচিত মেয়েটিকে হতে হবে তাদের বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ঐ সময়ে জোরে টিন বাজান হয়। রাজবংশী মেয়েরা কিংবা রংপুর কোচবিহারের কোচ জাতীয় মেয়েরা হুদুমা দেওরের মূর্তির চার পাশে উলঙ্গ হয়ে নাচে এবং গান করে। পুরুষ মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। ভোরে মেয়েরা যে যার ঘরে ফিরে যায়।

গানটি নিম্নরূপ ঃ

আয় আয় হুদুমা ও···
আয় আয় হুদুমা ও···
আয় ত্বরিতর ছুটিয়া
মেঘ নিয়া যা ভাসিয়া
আয় আয় হুদুমা ও
হুদুমা নিলি নাঙল জোয়াল
হুদুমী নিলি মই
আধ ঘাটাতে যায় হুদুমা
চিতর হয়া পই। ১৩

প্রাচীন লোকবিশ্বাস এভাবে নৃত্য গীত করে বৃষ্টি দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে বৃষ্টি হবে। এটিও একটি সদৃশ যাদু। নারী প্রকৃতি-স্বরূপা। নারীর সন্তান উৎপাদন এবং ভূমির শস্য উৎপাদন উভয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। বৃষ্টি কামনা মূলতঃ শস্য উৎপাদনের জন্য। ভূমি যেহেতু নিষ্প্রাণ তাই উৎপাদন সম্ভাবনা পূর্ণ নারীকে দিয়েই বৃষ্টি কামনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয় এই উৎপাদনক্ষম দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত, প্রার্থিত হয়ে বৃষ্টি ধারা নামবে। এখানে যে নগ্নতার প্রসঙ্গটি আছে তা আসলে যৌন মিলন সম্পর্কিত—যা

উৎপাদনের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এই নগ্নতা উৎপাদন বৃদ্ধির একটি আদিম প্রতীক। "উত্তর আমেরিকায় ফসলে পোকা ধরলে ঋতুবতী মেয়েরা রাত্রে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। ক্ষেতের পোকার প্রতিষেধক হিসেবে ইউরোপের কৃষি সমাজেও এ প্রথার প্রচলন আছে।"

উক্ত অনুষ্ঠানে যে টিন বাজান হয় তার দ্বারা মেঘ গর্জনের অনুকরণ করা হয়। সব মিলিয়ে এটি একটি সদৃশ যাদু বিশ্বাস।

দাঁত কামনার যাদু ঃ

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দাঁত পড়ে গেলে সেই দাঁত তারা গোপনে পুকুরে ফেলে দেয়। ঐ সময়ে সুর করে বলে ঃ

ফলুই মাছ ফলুই মাছ,
তোর সরু দাঁতটি দে—
মোর মোটা দাঁতটি লে। ১৪

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার মতে এই ভাবে বললে নতুন সরু দাঁত হবে। এটি সদৃশ যাদু-র কাছাকাছি গেলেও সদৃশ যাদু বলতে একটু দ্বিধা হয় কারণ 'মোটা দাঁত'টির বিনিময়ে 'সরু দাঁতটি' কামনা করা হচ্ছে। ঠিক অনুরূপ নকলটি কামনা না করে বিপরীত প্রকৃতির বস্তুটি কামনা করা হচ্ছে। মনে হয় আদিম সমাজে এটি সদৃশ যাদুই ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে শৌখিনতার জন্য মোটা বা বিশ্রী দাঁতের পরিবর্তে সরু সুন্দর দাঁতই কামনা করা হয়।

এ ব্যাপারে মার্কিন দেশের লোকবিশ্বাসটি হোল ছেলে মেয়ে যদি তাদের ভাঙা দাঁত বালিশের তলায় রাখে তবে এক সময় ইঁদুর তা নিয়ে যাবে এবং বিনিময়ে রেখে যাবে একটি রূপার মুদ্রা। ১৫

আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে ইঁদুরের কাছে দাঁতের কামনা করে বলা হয়—

ইঁদুর ইঁদুর আমার খারাপ দাঁতটি নিস
তোর ভাল দাঁতটি দিস। ১৬

ঐন্দ্রজালিক লোকসঙ্গীত ঃ

মেঘরাণী

বৃষ্টি আবাহন ঃ

চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময়ে মেঘরাণীকে শিণী মানৎ করা হয়। দুপুর বেলা প্রচণ্ড রোদে গ্রামের সকলে মাঠের মাঝে গিয়ে মাথায় টুপি না দিয়ে নামাজ পড়ে। পাড়ার লোকেরা গান গায়—

আয়রে মেঘরাণী
ঠেং ধুই ধুই ফেলা পানি।
ফেলা তলে গলা পানি
বিবি ফতেমা খোঁজে পানি।
আল্লা তুই দে রে পানি
কালা মেওঁলা ধলা মেঁওলা।
তারা দোন ভাই
উগ্যা লাচা ঝড় দেরে।
ভিজে পুড়ে যাই
আয়রে মেঘরাণী…। ১৭

পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কোথাও কোথাও ঢেঁকি পূজা করে বৃষ্টি আবাহন করা হয়, কোথাও গঙ্গাপূজা করা হয়। কোন কোন স্থানে বৃষ্টি আবাহনের জন্য ছেলে মেয়েরা ছড়া গান গেয়ে থাকে ঃ

আয় বৃষ্টি ঝেঁপ্যা
ধান দিব মেপ্যা।
ধানের ভিতর পোকা
জামাইবাবু বোকা।

লোকবিশ্বাস উক্ত আচারগুলি পালন করলে বৃষ্টি নামবে। এগুলি প্রকৃত অর্থে ঐন্দ্রজালিক গান বা ম্যাজিক সঙ্।

রৌদ্র আবাহান ঃ

রৌদ্র আবাহনের ক্ষেত্রেও এইরূপ ম্যাজিক সঙ্ প্রচলিত আছে। ভিন্ন দেশে লোকবিশ্বাস, এই গানগুলি গাইলে শীতকালে তাড়াতাড়ি সূর্যের আলোক আসবে এবং দ্রুত শীত কমে যাবে। তাতে দরিদ্র মানুষের দুঃখের অবসান হবে। প্রথমে আমরা পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত রৌদ্র আবাহন মূলক গানটির নমুনা প্রকাশ করছি—

আয় রোদ টেঁ্যণা
বদা দিব হেণ্যা
বদার মালো বুড়ি
কাঠ কুড়াইতে গেলু
ছ'খন কাপড় পেলু
ছ'বৌকে দিলু
আপনি মরে জাড়ে
কলা গাছের আড়ে
কলা পড়ে দুম দুম
বুড়া খায় কলাটি
বুড়ি খায় চপাটি। ১৮

উক্ত গানটি ছড়া গুণান্বিত। গানটি অতি প্রাচীন। বনে কাঠ কুড়ানোর প্রসঙ্গটিও এতে আছে। বুড়া কলা খায় সেই সঙ্গে নারী ভাগ্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত এতে পাওয়া যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলেও অনুরূপ শীতকালীন রোদ আবাহনের সঙ্গীত প্রচলিত আছে।—

রৈদলে রৈদানি
চাঁদার মার পুতালি।
চাঁদার উদয় বেলফুল
চিরচিরাইয়া রোদ তোল।
মউর মাথাৎ ডলু বাঁশ
হাত খলুন্যা অগন মাস
অগন মাইস্যা কউগা তেল

তেলৈন ফুডি মুরগা গেল
কোন বেঙ্গে ডাক দেয়
চিরচিরাইয়া রৈদ দেয়। ১৯

ফসল উৎপাদন ও ঐন্দ্রজালিক গান ঃ

মধ্য ইউরোপের প্রচলিত হলকর্ষণ সঙ্গীতে ছড়ার সুরই প্রাধান্য পেয়েছে। ওখানের লোকবিশ্বাস ঐ গানটি না গাইলে তাদের ফসল ফলবে না। এই গান ঐন্দ্রজালিক গুণান্বিত (ম্যাজিক সঙ্) গানটি নিম্নরূপ—

Meadow after meadow
one after another
The fires burn, The kettles boil
why do the kettles boil ?
Tomend the scyth for ?
What is the scyth for ?
To cut grass
what is ২০

আমাদের দেশে আশ্বিন মাসের শেষ দিন "নলসংক্রান্তি" পালন করা হয়। লোকবিশ্বাস এভাবে লোকাচার না করলে ধান শীষ "ফলবে" না। নলের একটি পাতার মধ্যে নানান বস্তুর গুঁড়ো পাটের দ্বারা জড়িয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে প্রত্যেক জমির কোণে একটি করে নল পুঁতে দেওয়া হয় এবং ছড়ার সুরে গাওয়া হয় ঃ

এ্যায় আছে ঝোট পাট
সব শনির মাথা কাট।
এ্যায় আছে কেঁউ
ধান ফলবে আড়াই বেঁউ।
এ্যায় আছে সুক্তা।
ধান ফলবে গজমুক্তা
এ্যায় আছে ক্ষুদারন্দি
ধান হবে কান্দি কান্দি।

এ্যায় আছে চিঙ্গুড় শুকা
সব শনি ভুঁয়ে লুকা।
নল পড়ল ভুঁঞে
শনি যা উত্তর মুঞে। ২১

এই আচার প্রকৃত অর্থে ধানের সাধভক্ষণ। এবং গানটি ঐন্দ্রজালিক গুণান্বিত। লোকবিশ্বাস এই গান গেয়ে নল জমিতে না দিলে ধান হবে না।

মাছ ধরার ছড়া সঙ্গীতে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস ঃ

মাছ ধরার সময় সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সুর করে এক জাতীয় ছড়া বলে—এটিকে লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু ছেলেরা ছড়ার সুরই পছন্দ করে। তাতেই তাদের মানসিক শান্তি। এগুলিকে তাই ছড়াগান বলা যেতে পারে। জীবনের ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন রকমের গান মানুষের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ছোট অবস্থায় ছড়াগান, যৌবনে প্রেমমূলক সঙ্গীত, বার্ধক্যে ভক্তিমূলক সঙ্গীত।

বঁড়শী দিয়ে মাছ ধরার সময়ে ছেলে মেয়েরা বঁড়শীর গোড়াটি ডান হাতে ধরে ডগাটি জলে পর্যায়ক্রমে আঘাত দিয়ে ও তুলে এক রকমের জলজ শব্দ করে এবং সুর করে ছড়াটি বল—

আয় রে আয় পুঁটি
তোকে দেব সোনার কাঁঠি
আয় রে কৈ, তোকে দেব পচা দই।
আয় রে ট্যাংরা, দেব তোকে মুড়া খ্যাংরা
আয় রে শিঙি দেব তোকে তালের ডিঙি। ২২

পাঠান্তর ঃ—

আয় রে পুঁটি তোকে দেব সোনার কাঁঠি
আয় রে কৈ তোকে দেব পচা দই
আয় রে ট্যাংরা তোকে দেব ফুল গাছের আংরা
আয় রে শোল তোকে দেব মুক্তকাল্লার ঝোল। ২৩

লোকবিশ্বাস—এভাবে আহ্বান জানালে বঁড়শীতে মাছ ধরা দিবে। ফলে এটি ক্রমে ক্রমে লোক সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে। বঁড়শী বা ছিপের ডগা দিয়ে জলে যে শব্দ করা হয় তা সদৃশ যাদুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোন কোন মাছ ডিম ফুটিয়ে যখন জলে ঘোরাঘুরি করে তখন ঐ রকম শব্দ করে দল বিচ্ছিন্ন অন্য চারাগুলিকে তারা আহ্বান করে। বঁড়শীতে এখানেও ঐ "সম প্রক্রিয়া" করা হয়। ছড়া গানের মাধ্যমে মাছকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করা হয়।

যাদুবিদ্যার একটি তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল মন্ত্র। কোন কোন অঞ্চলে মন্ত্রের দ্বারাও মাছকে আহ্বান জানান হয়।—

থুক কুড়ি থুক কুড়ি
জিন্দা মাছের বুরবুরি
যেখানে মাছের বর সেখানে বংশী পড়। ২৪

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে কোন কোন স্থানে পেছন দিক কাটা তসর গুটি ও মধুখড়ি একত্রে ব্যবহার করলে অন্যের মাছ পড়বে না, কিন্তু নিজের বঁড়শীতে বা জালে মাছ পড়বে এটিও একটি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। ২৫

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার আছে যখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন পৃথিবীর সঙ্গে সরাসরি দৈহিক সংযোগ না রেখে কোন গাছের উপর বসে বা কাঠের পিঁড়ির উপর বসে শণ বা পাটের দড়ি যদি তৈরী করা হয় এবং ঐ দড়ি দিয়ে জাল তৈরী করলে কিংবা ঐ দড়ি জালে বা বঁড়শীতে বেঁধে রাখলে বেশী মাছ পড়বে। কিংবা ঐ দড়ি দিয়ে যদি ঘণ্ডা, ঘুণী, বাটুয়া, পাটা জাতীয় মাছ ধরার বস্তু তৈরী করা যায় তার দ্বারাও বেশী মাছ ধরা যাবে। এ ছাড়া যদি কেউ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে এবং সেই দড়ি যদি জাল বা বঁড়শীতে বেঁধে রাখা যায় তাতেও বেশী মাছ পড়বে বলে বিশ্বাস করা হয়। এ ক্ষেত্রে আত্মহত্যাকারীর দাড়িটি সদৃশ যাদু বা "হোমিওপ্যাথী" যাদু দড়ির কাজ করে।

অন্যের জালে বা বঁড়শীতে যাতে কোন মাছ না পড়ে তার জন্যও এক জাতীয় ছড়া গান সুর করে গাওয়া হয়—

মাছ পড়ান্তি মাছ পড়ান্তি।
কেইল্যা সাপের বিষ।

যেই মাছটি পড়বি
কেইল্যা সাপে খাবি। ২৬

এখানে মাছকে কেলে সাপের ভয় দেখান হচ্ছে। যাতে বঁড়শীতে বা জালে মাছ কিছুতেই না পড়ে। এটিকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কৃষ্ণ যাদু বলা যেতে পারে।

কোন কোন সময়ে বঁড়শীতে মাছ না পড়লে বিশ্বাস করা হয় বঁড়শীতে কারও "মুখ" লেগেছে। তখন নিম্নের ছড়া গানটি সুর করে গাওয়া হয় এবং বঁড়শীকে শোধন করার জন্য আগুনে পোড়ান হয়। লোকবিশ্বাস এতে অসাধু, শত্রু, কিংবা অতৃপ্ত প্রেতাত্মা ইত্যাদি যে এই বঁড়শীতে কু-নজর দিয়েছে তার চোখ মুখ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়াটি প্রকৃত অর্থে একটি যোজক যাদুর উদাহরণ।

বঁড়শী বা ছিপ শুদ্ধ করার ছড়া সঙ্গীত—

বড়শী পুড়ি, বড়শী পুড়ি
মাছ ধরমু দুই কুড়ি,
লোয়ার বড়শী তায় ভোর
পুডি পাবদা, শিং মাগুর।
বড়শী আমার প্যাদা
ধইর‍্যা আনব ভ্যাদা
ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়
পুঁডি মাছে পান চিবায়
অ-হো-হো-হো-হি-হি-হি। ২৭

মন্ত্র বিশ্বাস :

বাংলায় প্রচলিত মন্ত্রগুলিকে ঠিক লোকসঙ্গীত বলা যাবে না। তবু লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার ও যাদুবিশ্বাস আলোচনার ক্ষেত্রে মন্ত্র বিশ্বাস আলোচনা না করলে যেন একটু ত্রুটি থেকে যায়। তাই কিছু কিছু মন্ত্র বিশ্বাসের উল্লেখ করা হচ্ছে। মন্ত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছড়া গুণান্বিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থহীন শব্দের সমষ্টি মাত্র। কোথাও সংস্কৃত শব্দ অনুকরণের চেষ্টা, কোথাও হিন্দী শব্দ, কোন কোন স্থানে ওড়িয়া শব্দেরও অবাধ প্রবেশ লক্ষ্য করা যাবে। বাঙালী জাতির রক্তে যে মিশ্রণ আছে মন্ত্রগুলির ভাষা পর্যালোচনা করলে তারও ইঙ্গিত

পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে মন্ত্রগুলি খুবই গোপণীয় এবং বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম। খুবই যত্ন সহকারে এগুলি লোকমানসে লালিত পালিত হয়। যথেষ্ট সম্ভ্রম সহকারে মন্ত্র বিশ্বাস-গুলি কাজে লাগান হয়।

সবক্ষেত্রেই যে মন্ত্রশক্তি কার্যকরী হয় এমন কথা বলা যাবে না তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই মন্ত্রশক্তি অসাধারণ কাজ করেছে তা আমরা ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে দেখেছি। সে ক্ষেত্রে কি ভাবে কি হোল তা ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। কিছু মন্ত্রের নমুনা দেওয়া হচ্ছে—

সাপের বিষ নামানো মন্ত্র ঃ

গ্রামাঞ্চলে সাপে ছোবল মারলে সাধারণতঃ এখনো ওঝা বা গুণীনকে ডেকে মন্ত্র চিকিৎসা করা হয়। ওঝা দু'ভাবে চিকিৎসা করেন প্রথমতঃ নির্দিষ্ট গাছের শেকড় বেটে খাওয়ার পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়তঃ "মন্ত্র ঝাড়ফুঁক" করে থাকেন। মন্ত্রগুলির কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

স্নান তর্পণ ছাড়ি গামছা দিয়া গায়
মনসাকে প্রণাম করি পথে চলে যায়।
পথে চলে যেতে গায়ে লাগে শীত,
বটবৃক্ষের তলায় বুড়িকে দেখে আচম্বিত।
বুড়ি বলে ওরে ব্যাটা তুই তো আমার শীত,
উমুকাকে ঝাড়তে যায় সাপ সাপিনীর বিষ।
নাই বিষ হেথা, নাই বিষ হোথা,
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞায়
পদ্ম পত্রে চরে পুঁঠি
বিষ উড়ে উজান ভাটি
ওরে বিষ হরা যেউ মুখে খাচ্যু,
সেউ মুখে মিল্যা। ২৮

অন্য একটি মন্ত্র ঃ

গৃহস্থের বউড়ি ভানিছে ধান
সরুয়া কাপড়ে লাগিছে ঘাম
ঘাম নয় সে মনহর
মনের বিষ তুই মনে মর।

উড়্যাল শঙ্খ চিল পৃথিবী করি ভর
এক নাই দুই নাই তিন টুসকে বিষ নাই
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞায়। ২৯

উক্ত মন্ত্রগুলির দ্বারা সাপের বিষ নামানো হয় লোকবিশ্বাস সাপকাটা রোগীর চিকিৎসা এতে সম্ভব। যখন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি তখন এই লোকচিকিৎসা দ্বারাই মানুষ আরোগ্যের চেষ্টা করত, এগুলি প্রকৃত অর্থে শুক্র যাদু।

আবার কিছু মন্ত্র পাওয়া গেছে যেগুলি প্রাচীন ভারতীয় যাদু তন্ত্রে "মারণ" নামে চিহ্নিত। সেই মারণ মন্ত্রে রোগ যাতে না সারে তার ব্যবস্থা করা হয়। আবার তা কাটানোর জন্য "আটকানো কাটান" মন্ত্রও আছে।

আটকানো কাটান মন্ত্র ঃ

ওঁ কুঞ্জবনে যমুনার কূলে
মোর প্রভু পড়িছন্তি ঢলে।
পরম ব্রহ্ম যোগী তুলছন্তি পানি।
গঙ্গার তীর নিরহিণী মন্ত্র রুসিঘিনী
অমুকের কুজ্ঞানের ব্যাধি তুই বহনে—
তোতে মহাগরুড় হুঙ্কারন্তি
রে ব্যাধি তুই বন্যে মিল্যা। ৩০

এগুলিও প্রকৃত অর্থে শুক্র যাদু এই মন্ত্রগুলির মধ্যে উড়িয়া প্রভাব লক্ষণীয়। লোকবিশ্বাস এবং লোকসংস্কার এই মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

আদিম লোকসমাজে মানুষের জ্বর হলে লোকচিকিৎসা শুরু হোত বিভিন্ন গাছ গাছড়ার নির্যাস খেতে দিয়ে। তারই পাশাপাশি চলত মন্ত্রতন্ত্রের ঝাড় ফুঁক। কোন কোন স্থানে বর্তমান কালেও এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

এ রকম একটি জ্বর ছাড়ানো মন্ত্র ঃ

জ্বর জ্বর পাথর গাদি
মহাদেবের আজ্ঞা

সোহাদেবের লিখন
এ জ্বর ছেড়ে যা এখ্‌খন।
উলু সুলু দিয়ে জ্বর
আলেন নিজ ঘরে
মহাদেব পাঠালেন জ্বর জুজুবার তরে।
তিন জ্বরে জুজু করে
দেখায় হবে কান্না
কোথায় তোমার রাজপতি
কোথায় তোমার স্থিতি।
উমুকার গায় এক পরিয়া
ভালুকের গায়ে অষ্ট ঘড়ি।
ইদ্‌জ্বর পীতজ্বর রাজ জ্বরা
দু'প্রহরের জ্বর অলমকি পালঙ্‌
গুরু শিষ্য একই ধারণ তুমি থাক সাক্ষী।

উক্ত মন্ত্রে সব সময় ছন্দ রক্ষিত হয়নি। দুটি ক্ষেত্রে শব্দ দ্বৈত সৃষ্টিও হয়েছে। 'সোহাদেব' কথাটি বোধ হয় মহাদেবের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতেই সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া অর্থহীন কিছু শব্দ সমষ্টি উক্ত মন্ত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অথচ লোক বিশ্বাস—উক্ত মন্ত্রে জ্বর সেরে যায়।

লোক সমাজে ভূত-প্রেত বিশ্বাস খুব তীব্র। কোন কোন মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে ভূত প্রেত ভর করে বলে বিশ্বাস করা হয়। তখন রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক নানা লক্ষণ দেখা যায়। গুণীন নানাভাবে রোগীকে ভূত মুক্ত করানোর চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে দ্রব্য গুণই প্রধান অবলম্বন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বস্তুগুলি ভূত ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়—(১) মান গাছের শিকড়, (২) তুলসী গাছের শিকড়, (৩) বট গাছের শিকড়। উক্ত বস্তুগুলি রোগীর শয্যায় রেখে দিতে হয়। তারপর একটি বেত নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করে রোগীকে তিনবার বেত্রাঘাত করতে হয়।

মন্ত্র— ওঁ কালী ওঁ তারা
কালী করি সার—
উমুকার অঙ্গে ভূত প্রেত ডাইনি যোগীন

শিগ্রী শিগ্রী ছাড়,
কার আজ্ঞায় মা কালীর আজ্ঞায়। ৩২

যে কোন বিপদ থেকে আগাম রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেহ বন্ধ "দেওয়া হয় নিম্ন মন্ত্রে—

দুর্গা কাটন্তি সুতো
মহাদেব বুনন্তি জাল
চোর নাহি চুরি করে
সাপে নাহি খায়।
দুর্গার কৃপায় আমার
সুখে নিদ্রা যায়। ৩৩

উক্ত মন্ত্রে 'কাটন্তি' এবং 'বুনন্তি' শব্দগুলিতে উড়িয়া ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উক্ত মন্ত্রে চোর সাপ এবং অনিন্দ্রা থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা জানান হয়েছে। লোক বিশ্বাস এভাবেই অতিন্দ্রিয় কোন ক্ষমতার কাছ থেকে প্রার্থিত বস্তুগুলি সহজে লাভ করা যাবে।

যে সমস্ত গাভীর দুধ কোন কু-ব্যাক্তি মন্ত্র প্রভাবে নষ্ট করে দেয় নিম্নোক্ত মন্ত্র প্রভাবে আবার উক্ত গাভীর বাঁটে দুধ আসবে বলে লোক—বিশ্বাস প্রচলিত। মন্ত্রটি নিম্নরূপ ঃ

ভার কাটাম সম্ভার কাটাম
মর্তে দিয়া পা
আপনি ভার সম্ভার কাটাম
জয় জগৎ গৌরী মা।
যে বেটা বেটি ভারিলেন ভার
মর্তে দিয়া পা
তার শিক্ষা গুরুর মস্তকে দিয়া পা।
হোক সে শিক্ষা গুরুর পা
সাত সহস্র শিক্ষা গুরুর মস্তকে দিয়া পা।
উমকার অঙ্গে ভার শিঙা চালান
কেটে যা।
কার আজ্ঞায়—মা জগৎ গুরুর আজ্ঞায়
শিগ্রী কেটে যা।

উক্ত মন্ত্রে অর্থহীন কিছু শব্দ আছে এছাড়া ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। কু-ব্যক্তিকে এবং তার শিক্ষাগুরুকে গালিগালাজ দেওয়ার প্রবণতা আছে। মোটকথা নানাদিক থেকে চেষ্টা করা হয়েছে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। মন্ত্রগুলির মধ্যে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার তীব্র। এগুলি গোপনচারী, এবং যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি পালন করা হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রগুলিকে গানের সুরে টেনে টেনে ব্যবহারের রেওয়াজ আছে—তবে সে সংখ্যা নিতান্তই অলপ। সঙ্গীতের দিক থেকে মন্ত্রগুলির কোন মূল্যই নেই। কিন্তু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের দিক থেকে মন্ত্রগুলির সামাজিক মূল্য অসাধারণ। লোক-বিশ্বাস যুক্ত মন্ত্র আমাদের দেশে অজস্র পাওয়া যাবে। আমাদের সংগ্রহের মধ্যেও তার সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু তাতে গ্রন্থের কলেবরই শুধু বৃদ্ধি পাবে মাত্র।

উল্লেখপঞ্জি

১। বাংলার লোক সংস্কৃতি—ওয়াকিল আহমদ—পৃঃ ৩৪৫।

২। লৌকিকসংস্কার ও মানব সমাজ—আব্দুল হাফিজ।

৩। লোকবিশ্বাস ও সংস্কার—ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী।

৪। Encyclopaedia of the Social Sciences—Vol. 10. The Macmillan & Co. 1951, Page 43.

৫। Sigmud Freud—Totem and Tabu (Page no. 78)

৬। Ralph & Beala and Harry Hoiyer—An Introduction to Anthropology—Page 554.

৭। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত—বিশ্বকোষ, ১৩শ ভাগ কলিকাতা ১৩০৯—ভোজবিদ্যা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৮। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ—আবদুল হাফিজ—পৃঃ ১৪৬।

৯। চলন বিলের লোকসাহিত্য—আব্দুল হামিদ পৃঃ ৯২।

১০। মোমেন শাহীর লোকসাহিত্য···পৃঃ ৪৫।
লোক সাহিত্য—আশরাফ সিদ্দিকী ২য় খণ্ড—পৃঃ ১০৯।

১১। চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য—অহীদুল আলম পৃঃ ৭৮।

১২। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ওয়াকিল আহমদ·পৃঃ ২২৩।

১৩। আরণ্য সংস্কৃতি—আব্দুল সাত্তার পৃঃ ১০৪।

১৪। নিজস্ব সংগ্রহ ১৯৮২ বর্ণনাকারী বিশ্বজিৎ মাইতি, ঘোলটুঙুর, মেদিনীপুর।

১৫। **North Carolina Folklore—Ed. new man Lyeywhit VI and VII 1961-Page 63.**

১৬। নিজস্ব সংগ্রহ বর্ণনাকারী—লীলাবতী মাইতি ঘোলটুঙুর, মেদিনীপুর, ১৯৮২।

১৭। চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য—ওহীদুল আলম, পৃঃ ৯১।

১৮। নিজস্ব সংগ্রহ ১৯৮০। বর্ণনাকারী নির্মলা ঘড়া—মোহনপুর, মেদিনীপুর।

১৯। চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য—ওহীদুল আলম, পৃঃ ৯৩।

২০। লোক সাহিত্য-২য় খণ্ড—আশরাফ সিদ্দীকী, পৃঃ ১১৫।

২১। নিজস্ব সংগ্রহ এপ্রিল ১৯৮৩ বর্ণনাকারী—বিজয়কুমার মাইতি, ক্ষুদিরাম ঘোড়াই, বিষ্ণুপদ সামন্ত—সাহড়দা, মেদিনীপুর।

২২। ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্ত—প্রবোধচন্দ্র বসু, পৃঃ ১৬৪।

২৩। নিজস্ব সংগ্রহ ১৯৮১—বর্ণনাকারী নির্মলা ঘড়া মোহনপুর, মেদিনীপুর।

২৪। লৌকিকসংস্কার ও মানব সমাজ—আবদুল হাফিজ, পৃঃ ১৭৪।

২৫। বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা—শোভারাণী চক্রবর্তী, পৃঃ ৯২।

২৬। নিজস্ব সংগ্রহ ১৯৮১ বর্ণনাকারী—করুণাময়ী মাইতি—অমিত মাইতি ঘোলটুঙুর, মেদিনীপুর।

২৭। আবু ইসহাক—সূর্যদীঘলবাড়ী কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য—তিতাশ চৌধুরী পৃঃ ১৪৩।

২৮। এই মন্ত্রগুলি পাওয়া গেছে—সত্যবতী ঘড়া, মোহনপুর, মেদিনীপুর এর কাছ থেকে। সংগ্রহ—১৯৮২।

২৯। ঐ।

৩০। ঐ।

৩১। বর্ণনাকারী ক্ষুদিরাম ঘোড়াই, সাহড়দা, মেদিনীপুর।

৩২। বর্ণনাকারী বিজয়কুমার পাণ্ডা, দণ্ডশিরা, মেদিনীপুর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা লোকসঙ্গীত ও লোকাচার

লোকসমাজে মানুষের প্রয়োজনে নানান আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। এগুলির দ্বারা মানুষের নানান মঙ্গল হবে—এই লোক বিশ্বাসে লোকাচারগুলি অনুসৃত এবং অনুষ্ঠিত হয়। এই লোকাচারগুলি প্রচলিত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। আদিম মানুষ তার নানান পরীক্ষায় এবং বিশ্বাসের দ্বারা এই লোকাচারগুলিকে সমাজে প্রবর্ত্তন করেছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে প্রতিটি জনসমাজে তার নিজস্ব লোকাচার রয়েছে। কোন লোকাচার তার নিজস্ব সৃষ্টি। কোন লোকাচার অন্য জাতির কাছ থেকে ধার করা। এই লোকাচারগুলির মধ্যে কোথাও ধর্মীর প্রেরণা ক্ষীণভাবে আছে। কোন কোন লোকাচারের লক্ষ্য আনন্দধারাকে প্রবাহিত করা। সবগুলির মধ্যেই কিন্তু লোক বিশ্বাস কাজ করেছে। আমাদের আলোচনা লোকসঙ্গীত কেন্দ্রিক লোকাচারগুলি। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এবং কর্ম এই নিয়েই আমাদের জীবন। কিন্তু মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচারে লোকসঙ্গীত কোথাও প্রচলিত আছে কিনা আমাদের জানা নেই তবে বাংলার লোকসঙ্গীতগুলি মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্যে নেই। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু বিষয়ক লোকাচারগুলির আলোচনা আমরা করছি না।

আমাদের আলোচনা শিশু জন্ম-নামকরণ-অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা ও বিবাহ বিষয়ক লোকাচারের মধ্যে জীবনের লোকবিজ্ঞান ও লোক বিশ্বাসকে অন্বেষণ করেছে। আবার ধান্যরোপণ, নলবাঁধা নবান্ন ইত্যাদি শস্য বিষয়ক লোকাচারের মধ্যে মানুষের কর্মগত চিন্তা ভাবনাকে আলোকিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিশু জন্মের লোকাচার ঃ

নতুন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দিদিমা, ঠাকুমা ইত্যাদি বয়স্কা মেয়েরা এক প্রকার গান গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। চব্বিশ পরগণা, ত্রিপুরা,

মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, বীরভূম, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শিশু জন্ম উপলক্ষ্যে গান প্রচলিত আছে। তিতাশ চৌধুরী তাঁর কুমিল্লা জেলার লোক সাহিত্য গ্রন্থে "নতুন শিশু অতিথির শুভাগমনে" 'পানতেল' অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন—সঙ্গে উক্ত অনুষ্ঠানের গীতটির উল্লেখ করেছেন ঃ

সোনার না ঘর খান রূপার না চানিয়ান চাহনি
সেই ঘরে জন্মিল জয়দর মালা রে···
জয়দর কান্দেরে···
জিগাইয়া চাও চেন, জয়দরের বাপেব টাধ
কি দিয়া লইব জয়দরে কোলেরে
জয়দর কান্দেরে··· ১

এই সমস্ত গানের মধ্যে কি উপহার দিয়ে নতুন শিশুকে বরণ করা হবে তারই উল্লেখ থাকে। কোথাও হাজার টাকার গাই। কোথাও নতুন জামা, খেলনা ইত্যাদির প্রসঙ্গ থাকে।

নতুন শিশুর আগমনে শিশুর মাতার কাছেও নানান খাদ্য পরিবেশনের আনন্দসূচক দাবী জানান হয় কোন কোন লোকসঙ্গীতে। চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রচলিত একটি লোকসঙ্গীতে তারই প্রতিধ্বনি দেখব—

কৈ কৈ কৈ মাগো তোর সোনার খোকা কৈ,
দুই হাত পেতেছি আজ ফুল বাতাসা কৈ।
তোমার খোকার রূপের বাহার, তুলনা নাই তাহার
দূর হতে এসেছি মোরা মুড়কি মোয়া কৈ।২

শিশু নামকরণের লোকাচার ঃ

শিশু জন্মানোর একমাস ছ'দিন পর শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে মেদিনীপুর জেলায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এটিকে ষষ্ঠী পূজার অনুষ্ঠানও বলা হয়ে থাকে। (পিংলা, ময়না, পাঁশকুড়া, ভগবানপুর, খড়্গপুর থানা) উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুকে একটি নতুন কাপড়ের উপর শোয়ান হয়। তারপর কাপড়ের চার কোণে চারজন হাত দিয়ে ধরে শিশুকে কাপড় সমেত শূন্যে তুলে দোলাতে থাকে। সাধারণতঃ পাঁচ বা

সাতবার দোলান হয়। তারপর তাকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। ঐ সময় সূতিকা ষষ্ঠীরও পূজা করা হয় এবং একটি তালপাতায় লৌহ-শলাকা দিয়ে শিশুর নাম লিখে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে মেদিনীপুর জেলায় ষষ্ঠী বুড়ির গান প্রচলিত থাকলেও ঠিক নামকরণের উপর কোন গান আমরা শুনিনি। তবে ময়মন সিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ থানায় এ ব্যাপারে প্রচলিত একটি গান সংগ্রহ করেছেন হাবিবুর রহমান। গানটি নিম্নরূপ ঃ

লাউলের ঘরে পোলা আইছে কি কি নাম থুইমু।
আম গা হাতে দিয়া আমাই নাম থুইমু॥
কলা গা হাতে দিয়া কলাই নাম থুইমু।
বেল গা হাতে দিয়া বেলাই নাম থুইমু॥৩

অন্নপ্রাশনের লোকাচার ঃ

বাঙালী হিন্দু পরিবারে শিশুর অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান একটি বিশিষ্ট লোকাচার। শিশু জন্মের পর পাঁচ সাত বা নয় মাস পরে সাধারণতঃ অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়। নির্দিষ্ট দিনে শিশুকে নতুন জামা প্যাণ্ট পরানো হয়। মালা ঘুনসী পরিয়ে কপালে দেওয়া হয় চন্দনের টিপ। অবস্থাপন্নরা সোনা বা রূপার অলংকার দান করেন নতুন শিশুকে। বিভিন্ন দেবতার পুজো দিয়ে নৈবেদ্য হিসেবে ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহ করা হয়। শিশুকে এবার কাঠের পিঁড়ির উপর বসান হয়। দিদিমা বা ঠাকুমা স্থানীয় বয়স্কা মেয়েরা পুজার ফুল ও বেলপাতা শিশুকে খাওয়ান। তারপর শিশুকে পায়স ও মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়। কোন কোন অঞ্চলে অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে গীতের প্রচলন আছে। এই সমস্ত গীতের মধ্যে কৃষ্ণের শিশুকালের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়।

নন্দরাণী যায় সিনানে খালি ঘর পাইয়া
সকল ঘর ভাসাইল গোপাল দধির ভাণ্ড দিয়া
রাণী দেখ না আসিয়া।
ননী খাইছে কে রে গোপাল, ননী খাইছে কে ?
আমি ত না খাইছি ননী, খাইছে বলাইয়ে
রাণী দেখনা আসিয়া
সকল ঘর······৪

ভাই-ফোঁটার লোকাচার ঃ

কার্ত্তিক মাসে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া তিথিতে বোন এবং দিদি ভাইকে ফোঁটা দেন। এই উপলক্ষ্যে নতুন জামা কাপড় পরান হয় ভাইকে, গলায় মালা পরিয়ে আসনে বসান হয় ভাইকে। ধান দূর্বা দিয়ে মঙ্গল কামনা করে কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। এই সময়ে বোন বা দিদি একটি ছড়া আবৃত্তি করেন—

ভাই-এর কপালে দিলাম ফোঁটা
যম-এর দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

এরপর ভাইকে নানান মিষ্টান্ন ও ফল এবং অন্যান্য খাদ্য খাওয়ান হয়। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে প্রচলিত গানটি নিম্নরূপ ঃ

আশ্বিন যায় কার্তিক আইয়ে গো,
দ্বিতীয়ার চান্দে দিল দেখা
ভাই দ্বিতীয়ারে দিলাম ফোঁটা।
ওরে ওরে কত রুয়াল, তুই সরে যাইতে
ভাইফোঁটার কথা শুনাতাম
গোবর আন্যা দিতে।
ওরে ওরে কর়ুয়াল তুই সরে যাইতে
ভাইফোঁটার কথা শুনতাম, মেথী আন্যা দিতে॥
ওরে ওরে করুয়াল, তুই সরে যাইতে
ভাইফোঁটার কথা শুনতাম আগ্রী আন্যা দিতে। ৫

উক্ত গানটি বাংলাদেশের মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ইত্যাদি জেলায় প্রচলিত আছে।

কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইকে ফোঁটা দেওয়ার রীতিটি কি ভাবে গঠিত হোল তা বলা কঠিন। এই ফোঁটার প্রসঙ্গে 'যমুনা'র কথাটিও কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়। যমের বোন যমী বা যমুনা। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যমী, যমকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেব সমাজে এই রীতির প্রচলন নেই। দেবতারা অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই যমীকে নিবৃত্ত করেছেন যম। একটি প্রশ্ন জাগে, যম এবং যমী কি তবে দেব গোষ্ঠীর কেউ নয়? তা যদি হোত, তবে বিবাহ

সম্পর্কিত প্রচলিত রীতিটি যমীর অজানা থাকত না। যাই হোক মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে জানা যায় যমী শেষ পর্যন্ত বলরামের সহগামিনী হতে বাধ্য হয়েছেন। যমী ভাইকে পতিরূপে গ্রহণ না করে ভিন্ন পুরুষকে পতিরূপে মেনে নিয়ে সমাজের মঙ্গল আদর্শকে রক্ষা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে যম। তাই বোধ হয় যমী ভাই-এর কপালে এই মঙ্গল সূচক ফোঁটা দিয়েছিল। পরবর্তী কালে বোনেরা কৃষিভিত্তিক পুরুষশাসিত সমাজে ভাই-এর উপর বেশ নির্ভরশীল হয়েছে। বিয়ের পরেও বাবার বাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী এই ভাই—ফসল তোলার পূর্বক্ষণে ভাইকে ফোঁটা দেওয়া হয়েছে একটি বিশেষ লোকবিশ্বাস অনুসারে যা পরবর্তী কালে যাদু মণ্ডিত একটি লোকাচারে রূপান্তরিত হয়েছে। কামনা ও বিশ্বাস করা হয়েছে উক্ত যাদুময় ছড়াটি আবৃত্তি করে ফোঁটা দিলে ভাই দীর্ঘায়ু হবে—যা বোনের সুখ ও সমৃদ্ধির একটি কারণ হয়ে উঠবে।

ধান্য রোপণ ও লোকাচার ঃ

বর্ষাকালে মাঠে ধান গাছের চারা রোয়া যেদিন শেষ হয় সেদিন জমির ঈশান কোণে দাঁড়িয়ে অন্যের জমি থেকে আঁচলা ভরে জল তুলে নিয়ে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে নিজের জমির ধান গাছে ঐ জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি তিনবার অনুসৃত হয়। বাড়ীতে ঐ দিন রাতে খেনো খই খেতে দেওয়া হয়। এই খেনো খই ধানের পূর্ণতার প্রতীক। এটি একটি হোমিওপ্যাথি ম্যাজিক বা সমপ্রক্রিয়ার যাদু। যে ছড়াটি ব্যবহৃত হয় তাও ঐন্দ্রজালিক ছড়া—ছড়াটি নিম্নরূপ ঃ

ঘাসের ক্ষয় ধানের জয়।
আড়াই দিনে ধান হালি (সবুজ) হয়। ৬

অন্য একটি ছড়ায় আদিম স্বার্থপরতা লক্ষ্য করা যাবে। সেখানে বলা হয়েছে সকলের ধান লাল হোক, আমার ধান সবুজ হোক। যে আমার ধানে লোভ করবে তার চোখে বালি পড়ুক—

সমেস্তকার ধান লাল হউ
আমার ধান হালি (সবুজ)।

আমার ধানকু যে নজর দব
তার চক্ষুর পড়িব বালি।

উক্ত ছড়া গানটিতে উড়িয়া ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

নল বাঁধার লোকাচার :

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে প্রায় প্রতিটি হিন্দু কৃষক পরিবারে নল বাঁধা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রকৃত অর্থে ধান গাছকে গর্ভবতী রমণী কল্পনা করে সাধ ভক্ষণের এবং কীটপতঙ্গ নাশের পরব। গাছের যে মানুষের মত প্রাণ আছে—এই চেতনা বহু আদিম কাল থেকেই মানুষের মধ্যে ছিল। এই অনুষ্ঠানটি তার প্রমাণ।

এই অনুষ্ঠান শুরু হয় আশ্বিন সংক্রান্তির আগের দিন দুপুর থেকে। ঐ দিন দুপুর বেলা পুরুষেরা নল কেটে এনে পুকুরের জলে রাখেন। তারপর বিকেলে কাঁচা নিমপাতা, হলুদ, ওল সংগ্রহ করেন। এছাড়া কেঁউফুল, বইড় পাতা, তিতো পাটের শুকনো পাতা (শুকতা), শুকনো চিংড়ি মাছ এক সঙ্গে জমা করে ঢেঁকিতে গুঁড়ো করেন। এই গুঁড়ো মশলার নাম আলই।

ইতিমধ্যে সধবা বা কুমারী মেয়েরা সংগ্রহ করে সাতটি শাক—কলমী, শুসনী, সজিনা, গীমা, পুঁই, নটে, থালকুনী ইত্যাদি। এগুলো একটি কুলোতে করে ফাঁকা স্থানে রাখা হয় যাতে রাতের শিশির ঐ শাকের উপর পড়ে। ঐ সময় 'ডাক ঠাকা' (ঝুড়ি) সাজান হয়। তাতে দেওয়া হয় —নিম পাতা, হলুদ, ওল, কেঁউফুল একটি চালতা, কিছু বইড় পাতা, একটি শশা গাছের ডগা। পূর্বোক্ত আলই একটি কলা পাতায় বেঁধে ঐ ঠাকায় রাখা হয়। কিছু তেতো পাটের রোয়া গুচ্ছ গুচ্ছ করে কেটে রাখা হয়। মেয়েরা সন্ধ্যায় নানা ধরণের পিঠে তৈরী করেন।

রাতে পুরুষেরা পুকুরে রাখা নলগুলিকে মাথায় তুলে নেয়। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা শঙ্খ ধ্বনি করতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ঐ নল নিয়ে একটি প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থানে পাড়ার সকলে একই ভাবে উপস্থিত হন। তারপর হরিধ্বনি দিয়ে নল গাছগুলি বাঁধা আরম্ভ হয়। মশলা বা আলই একটি বইড় পাতায় ভরে পুঁটলির মত তৈরী করা হয়। সেই পুঁটলি নলের গাছের ডগায় জড়িয়ে বেঁধে তারপর পাট

রোয়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এই ভাবে নল বাঁধা শেষ হলে হরিধ্বনি দিয়ে সকলে এক সঙ্গে উঠে পড়েন। মাথায় থাকে মশলা বাঁধা নলগুলি। ঐ নল তুলসিমঞ্চের কাছে রেখে দেওয়া হয়।

পরের দিন খুব ভোরে প্রত্যেকে জেগে ওঠেন। মেয়েরা আলই-কে শীল নড়ায় বেটে ছোট ছোট বটিকা তৈরী করে দেন। পুরুষেরা ঐ বটিকা খেয়ে তুলসীমঞ্চের পাশে রাখা নলগুলি কাঁধে তুলে নেন। প্রথমে একটি মুকুলিত নল গাছ তুলসীমঞ্চে দেন। তারপর অন্যান্য দেবস্থানে নল দিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ জমিতে গিয়ে উপস্থিত হন। জমির ঈশাণ কোণে নল পুঁততে পুঁততে আবৃত্তি করা হয়ঃ

এ্যায় আছে ঝোট পাট।
সব শনির মাথা কাট॥
এ্যায় আছে কেঁউ।
ধান ফলবে আড়াই বেঁউ॥
এ্যায় আছে সুক্তা।
ধান ফলবে গজমুক্তা॥
এ্যায় আছে ক্ষুদারন্দি।
ধান হবে কান্দি কান্দি॥
এ্যায় আছে চিঙ্গুড় শুকা।
সব শনি ভুঁঞে লুকা॥
নল পড়ল ভুঁঞে।
শনি যা উত্তর মুঞে॥ ৭

এই ছড়ার পাঠান্তরও লক্ষ্য করা যায়—

এতে আছে কেঁউ
ধান করে মিউ মিউ।
এতে আছে বড়ের খড়
ধান মাচা করে কড় কড়।
এতে আছে সুক্তা।
ধান ফলবে গজ মুক্তা॥

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে প্রচলিত ছড়ায় দেখা যাচ্ছেঃ

স্বর্গের জল মর্তের জল।
ধান ফলে গলগল॥

পাশের ধান আল আল।
আমার ধান শুধুই চাল॥

এ ছড়ায় একটু স্বার্থ চিন্তা বেশী বলেই মনে হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐদিন ভোরে একটি ডাণ্ডা কাঁধে নিয়ে নিজ জমির উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনবার আঘাত কবে আবৃত্তি করে—

হিন্দু কা যা বোল হামরা কা তা বোল
ধান ফোল ধান ফোল।

অবশ্য এটি হিন্দুর রীতি অনুসরণের পরবর্তী কালের প্রচেষ্টার একটি নমুনা মাত্র।

হাওড়া জেলায় প্রচলিত ছড়ায় কিন্তু সাধ ভক্ষণের কথাটি পরিষ্কাব ভাবে বলা হযেছে—

এতে আছে ঘি।
সাধ খাবে লক্ষ্মীর ঝি॥
এতে আছে মউ।
সাধ খাবে লক্ষ্মীর বউ॥

এখানে ধান গাছ কখনও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর 'ঝি'—(কন্যা) কখনও 'বউ' হয়েছে। সম্পর্ক যাই হোক না কেন উদ্দেশ্য ঠিকই আছে। প্রাচীন গ্রীসে শস্য মাতা দিমিতা এবং শস্য কন্যা পার্সিফোন এর প্রসঙ্গ প্রচলিত ছিল। এই সাধভক্ষণ বীতি প্রকৃত অর্থে একটি হোমিওপ্যাথী ম্যাজিক মাত্র।

নবান্নের লোকাচার ঃ

হিন্দুবা অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব পালন করে থাকেন। সাঁওতালদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'নাওয়াই'। লেপচাদের এই অনুষ্ঠানের নাম 'নামবান', আমেরিকায় এ জাতীয় অনুষ্ঠানের নাম 'থ্যাংকস গিভিং'। রাশিয়ায় 'রাদুনিৎসা'। হিন্দু কৃষক পরিবারে হেমন্ত ঋতুতে যখন নতুন ফসল ঘরে ওঠে তখন নবান্ন উৎসবের ধুম পড়ে যায়। নতুন চাল নতুন হাঁড়িতে দিয়ে ভাতরান্না করা হয়। নানান উপাদেয় তরকারীও প্রস্তুত করে মেয়েরা। নতুন গুড়ের দ্বারা পরমান্ন তৈরী করে দেবতা ও পূর্ব-

পুরুষদের নিবেদন করা হয়। তার পর প্রতিবেশীদের ডেকে সমস্ত রকম খাদ্য খেতে দেওয়া হয়। নবান্ন উপলক্ষ্যে ঢেঁকিতে চাল ছাঁটার সময় মেয়েরা গান গাইত ঃ

"ঢেঁক কুরাকুর ঢেঁক কুরাকুর
ধান ভানিরে।
ধান ভানিরে সোনার ঢেঁকি দিয়া
ধানের বরে গাই কিনিনু
দিমু পুতের বিয়া
ও ধান ভানি রে............।"

মেদিনীপুর জেলায় পিংলা, ময়না অঞ্চলে নবান্ন কোন কোন ক্ষেত্রে "পিপলেশ্বরী" দেবীকে নিবেদন করে তারপর পূর্ব পুরুষদের নিবেদন করা হয়। 'পিপলেশ্বরী' পিঁপড়ের লোকদেবী। তিনি সন্তুষ্ট হলে পিঁপড়ে ফসলের কোন ক্ষতি করবে না—এটি একটি লোকবিশ্বাস। পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পায়সান্ন বা নবান্ন কলা পাতায় রেখে খোলা স্থানে রাখা হয় যাতে কাক এসে তা খেয়ে যায়। নবান্নে কাককে নিমন্ত্রণ জানানো হয় এই ছড়া সঙ্গীত গেয়ে—

কো কো কো
মোদের বাড়ী হো
মোদের বাড়ী শুভ নবান্ন
মোদের বাড়ী খো

(বর্ণনাকারী—ব্যোমকেশ মাইতি—শিক্ষক, বেলুড়িয়া, মেদিনীপুর।)
কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত নবান্ন জলে ফেলে দেওয়া হয় যাতে মাছ তা খেয়ে নেয়। উভয় ক্ষেত্রেই তা মৃত পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। কাক এবং মাছ কি তবে পূর্ব পুরুষদের প্রতিনিধি? মিশরের সভ্যতায় প্রেত লোকের সঙ্গে কাকের একটু সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়—মাছ বা কাক-এর চিন্তা কি টোটেম চিন্তা থেকে এসেছে?

রাশিয়াতে প্রচলিত 'রাদুনিৎসা' অনুষ্ঠানের একটি মুখ্য লোকাচার মৃত পূর্বপুরুষ ও আত্মীয় স্বজনদের কবরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করা। আমেরিকার 'থ্যাংকস গিভিং' অনুষ্ঠানে ঐ দিন গীর্জাতে গীর্জাতে প্রার্থনা জানানো হয় দ্বিবিধ কারণে প্রথমতঃ মৃত পূর্ব পুরুষদের

আত্মার শান্তি কামনা, দ্বিতীয়তঃ সু-ফসল যাতে গৃহে ওঠে এবং শান্তি যেন আসে। আন্তর্জাতিক এই উৎসবের মধ্যে বোধ হয় একটি 'মোটিফ' কাজ করেছে—ফসল ভাল হয়েছে সেই আনন্দ সকলে ভাগ করে নিতে হবে—এমনকি পূর্বপুরুষ কিংবা মৃত আত্মীয় স্বজনদের আত্মাকেও এই আনন্দের ভাগীদার করা হয়।

লোকসঙ্গীতে বিবাহের লোকাচার

প্রাক বিবাহ সামাজিক ও পারিবারিক জীবন :

মানব সমাজ বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে নানান অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। পরিবার গঠিত হয়েছে আরও পরবর্তী কালে। এক সময় মানুষ দলবন্ধ হয়ে ঘোরাফেরা করত। সেই দলবন্ধ মানুষের মধ্যে অবাধ যৌন সংসর্গ প্রচলিত ছিল। সেই সমাজে কন্যার সঙ্গে পিতা, মাতার সঙ্গে পুত্রও যৌন সংসর্গে লিপ্ত হোত। সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের সেই অবাধ যৌন মিলনের স্তরটিকে বলেছেন, 'প্রমিসকিউয়াস' স্তর।

কন্যা
পিতা পুত্র প্রমিসকিউয়াস স্তর।
মাতা

এই স্তরের পরবর্তী স্তরে মাতা এবং পুত্র, পিতা ও কন্যার মধ্যে যৌন মিলন অবৈধ বলে বিবেচিত হোল ; কিন্তু প্রচলিত থাকল ভাই ও বোনের মধ্যে যৌন মিলন। এই স্তরের নাম "কনস্যানগুইন"। এই স্তরে সব পিতামহী সব পিতামহের স্ত্রী, সব মাতা সব পিতার স্ত্রী, সব বোন সব ভাই এর স্ত্রী রূপে চিহ্নিত হোত।

সব পিতামহী⇌সব পিতামহ
সব মাতা⇌সব পিতা = কন্স্যানগুইন স্তর।
সব বোন⇌সব ভাই (সম রক্ত পরিবার)

এর পরের স্তরে মাতৃ-প্রধান পরিবার এবং তারও পরে পিতৃ-প্রধান পরিবার প্রথা গড়ে উঠেছে। সমাজে যখন এ ভাবে অবাধ যৌন মিলন

অবৈধ রূপে ঘোষিত হোল তখন সমাজ স্বীকৃত যৌন মিলনের প্রয়োজন দেখা দিল। এই মিলনের অন্তরালে ছিল সুস্থ পরিবার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। এছাড়া এই ব্যবস্থায় সুপ্ত ছিল সন্তান সন্ততি পালনের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। যৌন মিলনকে সমাজ সম্মত এবং আইন সম্মত রূপ দেওয়া হোল বিবাহ প্রথার মাধ্যমে। বিবাহ কিন্তু শুধু মাত্র যৌন মিলনের সমাজ স্বীকৃত রূপ নয়—দেহ অতিক্রম করে দুটি মনকে ঘনিষ্ঠ করে তোলা, বংশধরদের রক্ষা করা এবং প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করাও বর্তমান বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য।

ভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহের বিভিন্ন প্রথা ঃ

প্রাচীন কাল থেকে উপজাতিদের মধ্যে নানান ধরনের বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলির মধ্যে কোন কোনটি লুপ্ত, কোনটি লুপ্ত-প্রায়, আবার কোনটি হয়তো এখনও জনপ্রিয় এবং প্রচলিত। অধিকাংশ উপজাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং আছেও।

১. পণ প্রথায় বিবাহ ঃ

এই প্রথায় বরপক্ষ কনেব অভিভাবককে পণের জন্য টাকা, গরু, মহিষ ইত্যাদি দেয়। সাঁওতাল, হো, ওরাঁও, বাগ্‌দী, বাউরী, নাগা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

২. শ্রমের বিনিময়ে বিবাহ ঃ

পণের টাকা সংগ্রহ করতে না পারলে বর, কনের বাড়ীতে চুক্তি অনুসারে দুই বা তিন বছর শ্রমদান করে। কিন্তু ঐ সময় কনের সঙ্গে বরের কোন যোগাযোগ থাকে না। এই শ্রমের বিনিময়ে সে কন্যাকে বিবাহ করে। সাধারণতঃ করকু, কুকী, বাইগা ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। মেচ সম্প্রদায়ের 'ঘর-জিরা' (গবই) প্রথাও এই প্রথার একটি রূপ।

৩. রাক্ষস বিবাহ ঃ

কন্যা এবং কন্যা পক্ষের মতের বিরুদ্ধে জোর করে বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। সাঁওতালদের-ইতুত-প্রথাও রাক্ষস বিবাহ।

৪. অনাহূত বিবাহ ঃ

রাক্ষস বিবাহের বিপরীত পদ্ধতি, অনাহূত বিবাহ প্রথায় লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে কন্যা তার মনোমত বরের বাড়ীতে জোর করে প্রবেশ করে এবং বরকে এই বিবাহে সম্মত করায়। করকু, হো, বীর হোড়দের মধ্যে এই প্রকার বিবাহ প্রচলিত।

৫. বিনিময় বিবাহ ঃ

বিবাহের পণ সংগ্রহ কষ্টকর হওয়ায় বিবাহে ইচ্ছুক দুটি পরিবার পরস্পরের মধ্যে পাত্র-পাত্রী এবং পাত্রী-পাত্র বিনিময় করে। এতে কেউ কোন পণ গ্রহণ করে না। করকু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

৬. প্রজাপাত্য বিবাহ ঃ

এই প্রথা বর্তমানে বহুল প্রচলিত। এক্ষেত্রে বর-কন্যা তাদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে ঘটকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রতি আদিবাসী ও হিন্দুদের মধ্যে এ জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে।

৭. সম্পত্তির লোভে বিবাহ ঃ

মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে বিধবার সম্পত্তি নিজেদের আয়ত্তে রাখতে ঐ পরিবারের কেউ বিধবাকে বিবাহ করে। এতে নিজের মাকে বিবাহ করা নিষেধ। কিন্তু সৎ-মা, ঠাকুমা, এমন কি শাশুড়ীকে বিবাহ করা চলতো। আসামের সেমানাগাদের মধ্যে এ জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে।

৮. শক্তি পরীক্ষায় বিবাহ ঃ

এই প্রথায় বিবাহের পূর্বে বর তার বুদ্ধির এবং দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিলে তবে বিবাহের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ভীল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে।

৯. পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বিবাহ (প্রবেশনারী ম্যারেজ) ঃ

এই প্রথায় ভাবী বর-কন্যা কয়েক সপ্তাহ পরীক্ষামূলক ভাবে পাশাপাশি বাস করে। যদি উভয়ের মনের মিল হয় তবে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ কুকী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে।

১০. **গান্ধর্ব বিবাহ :**

ভাবী বর-কন্যা ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে অভিভাবকের অমতে ভিন্ন স্থানে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে। বেশ কয়েক বছর পর তারা নিজ গ্রামে ফিরে আসে তখন তাদের আবার সামাজিক বিবাহ সংগঠিত হয়। লোধা, করকু, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে।

বিবাহের লোকাচারে লক্ষণীয় বিষয় :

বিবাহের লোকাচারের মধ্যে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়—(১) ধর্মীয় প্রভাব, (২) লোকবিশ্বাস ও সংস্কার—যাদু ও টাবু, (৩) সামাজিক স্বীকৃতিদানের জন্য নাচ গান ও প্রীতিভোজের ব্যবস্থা।

হিন্দু বিবাহের ভিন্ন লোকাচার :

বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন লোকাচার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুর বিবাহে মূল লোকাচারগুলি নিম্নরূপ—পাত্র পাত্রী নির্বাচন, পাকা দেখা, পানখিলি, অধিবাস ও তৈলকাপড়, চোরপানি, দধিমঙ্গল নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, ক্ষৌরকার্য, জলসহা, গায়ে হলুদ, আইবড় ভাত, সোহাগ মাখা, বর যাত্রা, বরবরণ, বর ও বরযাত্রী ভোজন, ছাদনাতলা, বরার্চনা, মুখচন্দ্রিকা, গৌরবচন, সম্প্রদান, সিন্দুরদান, পাশাখেলা, বাসিবিবাহ, কন্যার পতিগৃহে যাত্রা, বধূবরণ, বউ ভাত।

বর্তমানে গতিময় যুগে আনন্দকে দীর্ঘায়িত করার অবকাশ কমে যাওয়ায় মানুষ লোকাচারগুলিও সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। আবার সঙ্গীত পরিবেশনও অনেক কমে এসেছে। বরং ভূমিজ হো—খাড়িয়া, আদিবাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের লোকাচারে লোকসঙ্গীতের ধারাটি এখনও ক্ষীণ ভাবে প্রচলিত আছে।

বিবাহের সম্বন্ধের গান :

ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধের সূচনা সময় থেকেই লোকসঙ্গীত প্রচলিত হয়ে যায়। ঘটক প্রথমে বর ও কন্যার সম্বন্ধ সূচনা করে পরস্পরের অভিভাবকের কাছে। তখন মেয়েদের মধ্যে গান

গাওয়া শুরু হয়। এই সমস্ত গানে উভয় পক্ষের মধ্যে 'মান-মর্যাদার' ত্রুটি নিয়ে গান গাওয়া হয়।

বারে বারে বারণ করি, ঐ গাঁয়ে ঘর জুড়িয় না
ঐ গাঁয়ের লোকে বাবা, কুটুমের মান জানে না।

এই গানগুলি সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। অন্য একটি গানে দেখা যাচ্ছে—

কুটুমের মান জানে যদি, গামছা পাল্যেও ধুতি পরে না।
বাঁধা খাসি বাঁধাই রইল, বিরির ডাল বই দিল না।

বিবাহের নিমন্ত্রণ গীতি ঃ

এই গানগুলির মূল বক্তব্য বিবাহ অনুষ্ঠানে কাকে নিমন্ত্রণ করা হবে এবং কিভাবে নিমন্ত্রণ করা হবে। বর বা কন্যার মামাকে পান সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ করা এক প্রাচীন লোকাচার। মামাকে 'এক গাই' অর্থাৎ ১০টি এবং দিদিমাকে 'এক গাই' অর্থাৎ ১০টি মোট কুড়িটি সুপারী দেওয়া হয় মামা বাড়ীতে। বর্তমানে পানের পরিবর্ত্তে লিখিত নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হয়, এ ব্যাপারে প্রচলিত লোকসঙ্গীতটি হোল—

বিয়া বিয়া করি হামাদের কবে হবে বিয়া গো
বরের মামা ঘরে না পাইল পান গুয়া গো। ৮

গায়ে হলুদ ঃ

বিবাহের আগে গায়ে হলুদ মাখিয়ে বর ও কন্যাকে স্নান করানো একটি বিশিষ্ট রীতি। আদিবাসী সমাজের এই প্রথার নাম 'দা বাপলা সিবিং' এই লোকাচার সর্ব্বত্র একই রকম নয়। কোন কোন স্থানে একটি মাটির সরাতে হলুদ বাটা, দূর্বা, ধান, মাসকলাই ও হলুদ এবং সরিষার তেল রাখা হয়। এয়োরা বর বা কন্যার মাথায় ধান দূর্বা মাসকলাই তিল রাখেন। শঙ্খধ্বনি দেয় কেউ কেউ। তারপর বর বা কন্যার গায়ে তেল এবং হলুদ মিশিয়ে মাখিয়ে দেওয়া হয়। এই পর্ব শেষ হলে বর বা কনে স্নান সম্পন্ন করেন। উভয়ের বাড়ীতে পৃথক পৃথক ভাবে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় এয়োরা গান গায়—

মাঘ ফাল্গুন মাসে ঝলা* ঝড় বহে হে
কি মাখাবে হলুদ তেল গাহ** বড় জ্বলে হে ॥

বরকে তেল হলুদ মাখানোর গানটি নিম্নরূপ—এটি পুরুলিয়া জেলা থেকে সংগৃহীত।

চারি দিকে চৌখণ্ডন চন্দনের পিঁড়া গো,
হাত মেলিয়া দে রে বাছাধন মাখাব সুগন্ধ চন্দন। ১০

'গায়ে হলুদ' লোকাচারের মধ্যে সংগুপ্ত আছে লোকবিজ্ঞান। প্রথমতঃ হলুদ গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল করে। দ্বিতীয়তঃ হলুদ জীবাণু মুক্ত হতে সাহায্য করে। এখনও কারও হাত কেটে গেলে চুন ও হলুদ মিশ্রিত করার লোকচিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। আদিম যুগ থেকে এই লোকাচার প্রচলিত করে লোকসমাজ—বিবাহের পূর্বে অপরিচিত একজন মানুষের কাছে পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে যাওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত করেছিল।

কন্যা সাজানো :

এই অনুষ্ঠানে কন্যার সখী এবং এয়োরা কন্যাকে নানা বসন ও ভূষণে সাজাতে থাকে। পূর্বে ফুলের অলংকার পরানো হোত। পরবর্তী-কালে অবস্থাপন্নরা রূপার অলংকারও ব্যবহার করত। এ ছাড়া নানা প্রাকৃতিক প্রসাধনও তারা ব্যবহাব করত। এ ব্যাপারে প্রচলিত গানটি নিম্নরূপ—

সখী সাজাব তোকে মনের মতন
বিন্দাবনে রাধা সাজেন যেমন
চোখে কাজল দিব কপালে চন্দন
আজ সাঁজে তুই রাণী লো
লাচব মরা ডি ডিগ ডিয়া লো। ১১

কন্যা পক্ষ কর্তৃক বর আনার লোকাচার ও লোকসঙ্গীত :

কন্যা পক্ষ থেকে একজন পুরুষ, ঘটককে সঙ্গে নিয়ে বরের বাড়ী যায় বর আনার জন্য। তখন গানের মধ্য দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয় :

* ঝলা—রোদের তাপ।
** গাহ—শরীর।

বর আনবে বরাত আনবে
বরের ভাইকে আন না
বরের ভাইয়ের অলগা* ধুতি
আমার অঙ্গে সহায়** না

বরের ভাইটি যে খুব সুবিধার লোক নয় গানটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বর গমনের লোকাচার ও লোকসঙ্গীত ঃ

কন্যার বাড়ীতে যাওয়ার পূর্বে বর ধুতিপাঞ্জাবী পরে। কপালে নেয় চন্দনের ফোঁটা। গলায় পরে ফুলের মালা। মাথায় বাঁধে পাগড়ী। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে শোলার টুপি ব্যবহৃত হয়। নিতু বর থাকে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে বর যায় বিয়ে করতে। এত সব করে বরের একটু বিলম্ব হলে গানের মধ্যে চলে প্রশ্ন উত্তরের পালা—

কিসের এত ডেরী*** জামাই কিসের এত ডেরী
তোমার বাবার পালকি সাজাতেই হল নাকি ডেরী ॥ ১৩

ছাদনা তলায় ঃ

বরকে ছাদনা তলায় পৌঁছান হয়। কন্যাকে একটি কাঠের পিঁড়িতে চড়িয়ে কন্যার মামা নিয়ে আসে ছাদনা তলায়। অভিভাবক কন্যা সম্প্রদান করে—তখন চলে নাচ গান—

আজ আমাদের ছোটবাবুর বিহালো
আজ আমাদের ছোটবাবুর বিহা
মদখাব বতল বতল নাচব
ডিডিগ ডিয়া লো ॥ ১৪

বর-কন্যা বিদায় ঃ

বিয়ের পর কন্যা যায় বরের সঙ্গে। ঘনিয়ে আসে বিচ্ছেদ, মিলনের মহালগ্নে। কন্যার বাবার বাড়ীতে নামে শোকের ছায়া। কন্যা গায়—

* অলগা—খোলা।
** সহায়—সহ্য হয় না।
*** ডেরী—দেরী—বিলম্ব।

এক আগুই আগুই দুধের ঝারি
পেছুই পেছুই গাড়ী গো।
আস্তে আস্তে চালাও গাড়ী
বাবার রোদন শুনি গো ।।
বাবার রোদন যেমন তেমন
মায়ের রোদন ভারি গো।
ঐ রোদনায় ভিজে গেল
মেঘ-ডুম্বুরা শাড়ি গো ।।

এই বিদায় ক্ষণে কন্যা তার খেলার সঙ্গীটিকেও ভুলে না—

কাকে মনে পড়ে মুনু, মাকে না বাবাকে
মাকে নাই বাবাকে নাই গো
খেলবার বার সংগাতকে ১৫

বরের বাড়ীতে বৌকে নিয়ে যাওয়ার লোকসঙ্গীত ঃ

কন্যার বাড়ী থেকে বেরিয়ে বর কন্যা যখন বরের বাড়ীর পথে পা বাড়ায় তখন নিম্নোক্ত গানগুলি হয়—

থাক লো কন্যার মা শুধা ঘরটি নিয়ে
তোর বিটিকে নিয়ে যাচ্ছি গিড্‌লা গাড়ুম করে ॥ ১৬
(শুধা—শুন্য)

অন্য একটি গান—

ছামড়ারি পাত গিলা, বাজে রুনু ঝুনু
ভাগ্যে ছিল আমার দাদালো
বহু আলি ছুম্বুর ছ ঝুম্বুর
(বহু—বউ, আলি—এলি)

বউ নাচনীর লোকসঙ্গীত ঃ

এই প্রথা আসামের খাসিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বে প্রচলিত ছিল। সিলেটের কোন কোন গ্রামে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা এই প্রথা অনুসরণ করেন, তবে বর্তমান শিক্ষাপ্রসারের জন্য এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে

যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে শ্বশুর বাড়ীতে নববধূকে নাচ ও গান করতে হয়। গানটির বহু পাঠান্তর আছে। একটি মাত্র পাঠ দেওয়া হচ্ছে—

সোহাগ চাঁন বদনী ধনি নাচো তো দেখি
নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি
যেমনি নাচুইন নাগর কানাই
তেমনি নাচুইন রাই।
নাচিয়া ভুলাও তো দেখি নাগর কানাই
রাই নাগর কানাই।
নাচুইন বালা সুন্দরী এ পিন্দুইন বালা বেশ।
হেলিয়া দুলিয়া নাচে সুন্দি জালি বেত
সুন্দি জালি বেত।
ঝুমুর ঝুমুর নাচুইন বালা ঠমক ঠমক চায়
নাচিতে নাচিতে রাইয়ার বাঁশিটি লুকায়
রাইয়া বাঁশিটি লুকায় ॥ ১৭

(চান-চাঁদ, পিন্দুইন-পরিধান)

লোকাচার ভিন্ন ক্ষেত্রে

দধিমঙ্গল ও ঢেঁকিমঙ্গল ঃ

বিবাহের লোকাচার আলোচনা শেষ করার আগে দধিমঙ্গল ও ঢেঁকি মঙ্গল সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই দুটি মঙ্গলই বিবাহের লোকাচারের অন্তর্গত।

দধিমঙ্গল ঃ

হিন্দু বিবাহে 'চোরপানি' লোকাচারের পরেই দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানটি হয়। বিয়ের দিন সকালে চোরপানি ভরে এসে কন্যার কপালে দধি ও চন্দনের মঙ্গলসূচক ফোঁটা দেওয়া হয়। তারপর কন্যার মা সধবা মেয়েদের নিয়ে কন্যার সঙ্গে দধি ও চিঁড়ে খান। অবশ্য ঢাকা ও বিক্রমপুর অঞ্চলে ভিন্ন প্রথা অনুসৃত হয়। সেখানে বর কনে

দই খান এবং দই এর ভাঁড়টি আটটি ভাগে ভাগ করে ভেঙে ফেলেন। গানটি নিম্নরূপ—

দধি মঙ্গল করে সীতা রাণী গো আয় সকলে
আন দধির ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড
আন গো ক্ষীরের ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড
আন গো চিঁড়ার ভাণ্ড, ভাইঙ্গে কর আষ্ট খণ্ড।
আন গো সকালে সকালে
দধি মঙ্গল করে বিধুমুখী গো আয় সকলে ॥ ১৮

ঢেঁকিমঙ্গল :

ঢেঁকি এক সময় গ্রাম বাঙলায় চাল তৈরীর প্রধান যন্ত্র ছিল। এ ছাড়া চিঁড়ে ছাতু (মুড়ির) ইত্যাদিও এই ঢেঁকির সাহায্যে তৈরী করা হোত। গায়েহলুদ অনুষ্ঠানের জন্য এই ঢেঁকিতে হলুদও কোটা হোত। তাই বিয়ে করতে যাওয়ার আগে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কোথাও কোথাও ঢেঁকিকে সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে মঙ্গল করতো বা 'মুঙ্গলাতো'। এই সময় হিন্দু মেয়েরা গায়—

সুমন্ত্রের বাণী শুনে রাজ রাণী
বলিলেন তখন, কৌশল্যা গো রাণী ॥
আন এয়োগণ, যত ছানার সন্দেশ
তেল সিঁদুর দিয়ে ধান্যভানে রাণী ॥ ১৯

এ ব্যাপারে মুসলমান সমাজে প্রচলিত গানটি নিম্নরূপ—

চোখ মুজি মুজি চোখে চাই
ঢেঁকি মুঙ্গলানো দেখে যাই।
গাল ভরে পান পাই
সিঁথি ভরে সিঁদুর পাই
তাইতো ঢেঁকি মুললে যাই ॥ ২০

সাধভক্ষণের লোকাচার ও লোকসঙ্গীত :

গর্ভবতী রমণীকে ৫, ৭ ও ৯ মাসে বিভিন্ন লোভনীয় খাদ্য খেতে দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে তারই নাম সাধ ভক্ষণ। এটি বিশিষ্ট

লোকাচার। পঞ্চম মাসে প্রথম 'সাধ' দেওয়ার অধিকারী, রমণীটির বাবা ও মা। এরপর 'সাধ' দেয় শ্বশুর ও শাশুড়ী, পরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। সাধারণতঃ বেজোড় মাসেই সাধ ভক্ষণ করান হয়। কৃষ্ণপক্ষে 'সাধ' দেওয়া নিষেধ। অনুষ্ঠানের প্রথম গর্ভবতী রমণীকে শুভ সূচক তুলসীর মালা ও ঘুনসী পরানো হয় তারপর প্রসাধন পর্ব সেরে নূতন কাপড় চোপড় পরানো হয়। দেব প্রণাম ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে রমণীটি কাঠের পিঁড়ি কিংবা আসনে বসেন। এবার লুচি, মিষ্টি, পায়স ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়। সঙ্গে খেতে বসেন মাতৃস্থানীয়া অন্য কয়েকজন রমণী। এঁদের খাওয়া হলে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র খাদ্যে আপ্যায়িত করা হয়। পূর্ব অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে যে বেজোড় মাস স্থির করা হয় তা সম্ভবতঃ জোড়া সন্তান যাতে না হয় এই লোকবিশ্বাস অনুসারে। আবার মাতৃস্থানীয়া রমণীর সঙ্গে গর্ভবতী রমণীকে খেতে দেওয়া হয়—কারণ মাতৃস্থানীয়ারা সু-প্রসবের অধিকারিণী—লোকবিশ্বাস ঐ সু-প্রসবিনীগণ কাছে থাকলে গর্ভবতী রমণীটিরও সুপ্রসব হবে। গর্ভাবস্থায় রমণীটির নানান বস্তু খাওয়ার লোভ হয়। লোকসঙ্গীতের মধ্যেও সে কথা বলা হয়েছে—

লাউলের বউ লো সাধন্তি
কি কি খাইতে সাধ ?
ঘরের ছাঁইচে নলভোগ ছিম
তাই খাইতে সাধ।
ঘরের ছাঁইচে কাজলা ছিম
তাই খাইতে সাধ।
বরইর অম্বল কড়কড়া ভাত
লেবু পাতা আর পান্তা ভাত ॥ ২১

সাধভক্ষণের মধ্যে একটি লোকবিজ্ঞান কাজ করেছে। নানান লোভনীয় বস্তু খেতে দিয়ে গর্ভবতী রমণীকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করা হয়, যাতে গর্ভস্থ সন্তানটির সুবিকাশ হয়। আগামী কষ্টকর প্রসবের কথা যাতে রমণীটির মনকে আতঙ্কিত না রাখে তার জন্যও এই আনন্দময় রীতিটি প্রচলিত।

উল্লেখপঞ্জী

১. কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য—তিতাশ চৌধুরী—পৃঃ ২১৬।
২. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য—২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১৫।
৩. বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ—হাবিবুর রহমান—পৃঃ ৮৯।
৪. কুমিল্লা জেলার লোকগীতি—তিতাশ চৌধুরী—পৃঃ ২১৭।
৫. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৫৫।
৬. নিজস্ব সংগ্রহ—বর্ণনাকারী—শ্রীবিজয়কুমার মাইতি, সাহড়দা, জেলা—মেদিনীপুর।
৭. নিজস্ব সংগ্রহ—বর্ণনাকারী শ্রীবিজয়কুমার মাইতি, ক্ষুদি ঘোড়াই, বিষ্ণু সামন্ত। সাহড়দা, মেদিনীপুর।
৮. সীমান্ত বাংলার লোকযান—সুধীর করণ—পৃঃ ৩৪৭।
৯. ঐ, পৃঃ ৩৪৮।
১০. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৬—বর্ণনাকারী শচীন সামন্ত, বান্দোয়ান—পুরুলিয়া।
১১. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৪—আমদান—মেদিনীপুর।
১২. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৬ বান্দোয়ান—পুরুলিয়া।
১৩. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৬—বান্দোয়ান—পুরুলিয়া।
১৪. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৬—বান্দোয়ান—পুরুলিয়া।
১৫. ঐ
১৬. ঐ
১৭. আরণ্য সংস্কৃতি—আবদুস সাত্তার—পৃঃ ১৬৮।
১৮. লোকসঙ্গীত রত্নাকর—২য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৯২৫।
১৯. লোকসঙ্গীত রত্নাকর—২য় খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৮৮৫।
২০. বিবাহের লোকাচার—দীনেন্দ্রকুমার সরকার—পৃঃ ১৩৮।
২১. লোকসঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৬১৫।

তৃতীয় অধ্যায়

লোকসঙ্গীতে লৌকিক দেবদেবী

দেবতা সৃষ্টির মূল উৎস সম্ভবতঃ অলৌকিকতায় বিশ্বাস এবং যাদুশক্তির প্রতি আস্থা। আদিম মানুষ যখন কোন বস্তুর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারত না তখন তার মধ্যে অলৌকিক কিংবা "যাদুগুণ সম্পন্ন" কিছু শক্তি আছে বলে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস থেকে সূর্য, মেঘ, জল, বাতাস, পাহাড়, বন, গাছ, নদী ইত্যাদির মধ্যে দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের প্রপিতামহগণ মনে করতেন—ঐ সকল "যাদুগুণ সম্পন্ন বস্তুগুলি সন্তুষ্ট হলে মানুষের উপকার করতে পারে। আবার ওরা রুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। এই জন্য আদিম মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে নিজের ও পরবর্তীকালে সমাজের কল্যাণের জন্য সূর্যদেবতা, বরুণ দেবতা, হুদুম দেওর, পবন দেবতা, ইত্যাদিকে তাঁদের পূজা নিবেদন করে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

পরবর্তীকালের বিজ্ঞান সচেতন মানুষও পূর্বপুরুষদের আচরিত পদ্ধতিকে অন্ধ আবেগে অনুসরণ করে এসেছে। এ যেন তাদের উত্তরাধিকারের প্রয়োগ। মানুষের আদিম সমাজে প্রথম নারীর প্রাধান্যে 'মাতৃকেন্দ্রিক' সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। আসলে তখন সন্তানের পিতৃ পরিচয় সুনির্দিষ্ট করার উপায় ছিল না। কিন্তু মাতা নির্ণয় ছিল সুনির্দিষ্ট। তাছাড়া ফলমূল সংগ্রহ ও কৃষিকর্ম মূলত ছিল নারীর হাতে, তাই 'মাতৃকেন্দ্রিক' সমাজ ব্যবস্থা ছিল প্রচলিত। সেই সমাজে 'মাতৃকা পূজা' শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে শিকার পশুপালনের মাধ্যমে পুরুষ প্রাধান্য শুরু হয়। তখন সমাজে পুরুষ দেবতাদেরও প্রাধান্য সূচিত হয়। বৈদিক দেবতারা অধিকাংশই পুরুষ। পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য লৌকিক দেবদেবী আছেন। দুটি তালিকা থেকে তাদের কিছু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র লৌকিক দেবদেবীর নামের তালিকা

পশ্চিমবঙ্গে বহু বিচিত্র দেবদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। আবার একই দেবদেবীর কত যে বিচিত্র ভিন্ন নাম পাওয়া যায় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এমন গ্রাম রক্ষক দেবদেবী আছে যাদের নাম, গ্রাম গোষ্ঠী, ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

ক. গ্রাম রক্ষক দেবী :

দুয়ারসিনি (দ্বার রক্ষক), ভেদাসিনি, মাতাসিনি, মালরাঁধিসিনি, মদনাসিনি, লোধাসিনি (গোষ্ঠী), কয়াসিনি, কালাসিনি, মণ্ডলাসিনি, কুদরাসিনি, বিন্ধবাসিনি, মাচাইসিনি, বালি-বিলাসিনি, ঝাড়বনিসিনি, শিকড়বাসিনি, রুপাসিনি, নাচনজামসিনি ইত্যাদি।

খ. অন্যান্য দেবীদের নাম :

হিড়িম্বেশ্বরী, কালনাগিনী, হারিয়াতাড়া, হরিয়াবুড়ী, তিস্তাবুড়ি, গেঁড়িবুড়ি, শীতলাবুড়ি, লাটাইবুড়ি, কালাকাতরবুড়ি, ষষ্ঠীবুড়ি, ডমনী, বুমকেশ্বরী, মঙ্গেশ্বরী, হাউড়িমা, ফুলমানদেবী, ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, জাহিরবুড়ী, বড়ামবুড়ী, শিলাইবুড়ী, রঙ্কিণী, সাতভাউনী, পলাশাই (পলাশবতী), হিঙ্গলাই (হিঙ্গুলবতী), মেলাই (মেলাবতী), খেপাই (ক্ষিপ্তবতী), বেতাই (বেত্রবতী), বাশুলী, বাহারী, কামারবুড়ী, হিড়িমাই (হিড়িম্ববতী), কেঁদুয়াবুড়ী, ডাকাইবুড়ী, মহামাই। বর্গভীমা, সনকাদেবী, বলদবাহিনী, ঘেঁটু, হাটঘুরণী, কুকুড়ামনি (কালি), বসন্তঠাকরুণ, হাড়িঝিচণ্ডী, আটবাই-চণ্ডী, বেতাইচণ্ডী ইত্যাদি।

গ. ভূত প্রেত দেবতা ঃ

এদের কোন নির্দিষ্ট বেদী নেই। মন্ত্র দিয়ে ডাকলে এরা উপস্থিত হয়। বাঘুৎবীর, হনুমানবীর, গোমুঞাভূত, এঁস্যাপেঁতী, মনপাট, চেলা, পাটমনসা, লোধা-লোধানী, পূর্বপুরুষ, গুরুদেবতা, ডোমগুরু, সিদ্গুরু, সুপুরুষা, কুপুরুষা, বাউটীর মেয়ে, ইত্যাদি।

ঘ. দেবতাদের তালিকা ঃ

আটেশ্বব, মাকাল ঠাকুর, কালুরায়, দক্ষিণরায়, বাবাঠাকুর, বসন্তরায়, মানিকপীর, ক্ষেত্রপাল, ঘাটুদেবতা, সত্যপীর, ধর্মঠাকুর, কালবেতাল ভৈরব, কালিয়া বদা (কালোপাঠা), কালিয়া ষাঁড়, বুড়োদামাল, বীর ঝাপট, ভীমঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর, কার্তিক ঠাকুর, পাঁচু ঠাকুর ইত্যাদি।

ঙ. শিব ভিন্ন নামে ঃ

দণ্ডেশ্বর, ঝাড়েশ্বর, জলেশ্বর, ভুবনেশ্বর, খড়্গেশ্বর, শ্যামলেশ্বর, চন্দনেশ্বর, হটেশ্বর, তিলেশ্বর, ঝগড়েশ্বর, গঙ্গেশ্বর, ক্ষীরেশ্বর, স্বপ্নেশ্বর, চপলেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, পাঁচলেশ্বর, ভুড়ভুড়ি কেদার, কেদারেশ্বর, কেদারনাথ, শৈলেশ্বর, ষাঁড়েশ্বর, বিহারীনাথ, সিদ্ধেশ্বর, মল্লেশ্বর ইত্যাদি।

চ. চণ্ডী ভিন্ন নামে ঃ

খেলাই চণ্ডী, মেলাই চণ্ডী, নীলাই চণ্ডী, খুদাই চণ্ডী, সানাই চণ্ডী, আটবাই চণ্ডী, ঝগড়াই চণ্ডী, সর্বমঙ্গলা উগ্র চণ্ডী, বিশালাক্ষী, বিজয় চণ্ডী, জয় চণ্ডী ইত্যাদি।

বিভাগ অনুসারে লৌকিক দেবদেবীর তালিকা

রোগ ব্যাধির দেবদেবী ঃ

রোগের নাম	হিন্দুদের দেবদেবী	মুসলমানদের দেবদেবী
কলেরা	কালি, ওলাই চণ্ডী	ওলাবিবি
হাম, বসন্ত	শীতলা	ঝোলাবিবি
সান্নিপাতজ্বর বিকার	×	মড়িবিবি
খঞ্জ	পঞ্চানন্দ	ঘোড়াপীর
অসুখ	×	আসানবিবি

পশুপাখীর অধিপতি দেবদেবী

পশুর নাম	হিন্দুদের দেবদেবী	মুসলমানদের দেবদেবী
গরু	গোরক্ষনাথ, সোনারায়, ত্রিনাথ, বসন্তচণ্ডী, বড়মা	মাণিকপীর, সোনাপীর, ত্রিনাথপীর
বাঘ	দক্ষিণ রায়, কালুই ঠাকুর	গাজীপীর বাঘাইপীর গাজী সাহেব বড়খানাপীর
মাছ	মাকাল ঠাকুর	×
কুমীর	কালুরায়	গাজীকালু
সাপ	মনসাদেবী	×
কাক		কাউয়াপীর
সন্তান	কার্তিক, ষষ্ঠীবুড়ি	×

প্রকৃতি বিষয়ক

বন	বনদুর্গা, অরণ্যষষ্ঠী	জংলীপীর, বনবিবি
বৃষ্টি	হুদুমদেও, মেঘরাজা, মেঘরাণী	×
জল	বরুণ	খেয়াজ খিজির
আগুন	অগ্নি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র	মাদারপীর
ক্ষেত্রভূমি	ভীম	×

নৌকা	×	বদরপীর
সম্পদ	লক্ষ্মীদেবী	লক্ষ্মীপীর, জুম্মাপীর
গৃহ	গৃহদুর্গা, বাস্তুদেবী	বাস্তুবিবি
ঢিল, নোড়া, ন্যাকড়া	ঢেলাইচণ্ডী	নোরাপীর, টেনাপীর

বাংলা দেশের বিচিত্রতর লৌকিক দেবদেবীর নাম উক্ত দুটি তালিকা থেকে জানা যেতে পারে। অবশ্য তালিকা দুটি আংশিক মাত্র। এছাড়া আরও অনেক দেবদেবী আছেন গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নির্বাচিত কয়েকজন দেবদেবীর আলোচনা করব। গ্রামে এঁদের উদ্দেশ্যে সংগীতও প্রচলিত আছে।

ভীম ঠাকুর

"চন্দ্রচূড় চলে বৃষে চণ্ডী রন চায়্যা
পিছু ভীম চলিল, চাষের সজ্জা লয়্যা"

—শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য

পুজার স্থান :

লোককাব্যে ভীম চাষীরূপেই চিহ্নিত। মেদিনীপুর জেলাতেই ভীম পূজার বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে ভীম ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়। ঐ একাদশীর অন্য নাম ভীম একাদশী। মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভীম ঠাকুরের পূজা হয়। কোন এক গবেষক মনে করেন ভীম পূজার উৎস এবং কেন্দ্রস্থল মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা। একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করে

নেওয়া যায় না। পাঁশকুড়া থানার প্রতাপপুরের ভীমতলার পুজোও কম প্রাচীন নয়। ঘাটাল, তমলুক, খড়্গপুর, রঘুনাথবাড়ী, পাঁশকুড়া, প্রতাপপুর, ময়না, পিংলা, মালিগ্রাম, ছোটখেলনা সাহড়দা, পশং, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানে উক্ত তিথিতে ভীম পুজো হয়ে থাকে। সাধারণতঃ খোলা মাঠে, চৌরাস্তার মোড়ে বা জনবহুল প্রকাশ্য স্থানে ভীম ঠাকুরের পুজো হয়ে থাকে।

দেবতার আকৃতি ঃ

মহাভারতের দ্বিতীয় পাণ্ডবের আদলে ভীমদেবতার মূর্তি গড়া হয়। খুব ভাল পেশীবহুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এই মূর্তি। উচ্চতায় ১০—১২ ফুট। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চওড়া পাকানো সযত্ন লালিত গোঁফ। চওড়া কালো জুলপি। গায়ে সবুজ ফতুয়া (এটি সব ক্ষেত্রে থাকে না) হাঁটু পর্যন্ত সাদা কাপড়, চওড়া পাড়। পায়ে নাগরা জুতো। ডান হাতে ভীষণাকৃতি গদা। বড় বড় চোখ। কানে বড় বড় বালাকৃতি দুল হাতে মোটা বালা। গায়ের রঙ লালচে হলুদ। ঠোঁট লাল। এক কথায় প্রথম দর্শনে ভীষণাকৃতি এই ভীম মূর্তি। প্রত্যেক বছর মূর্তির অবয়ব বদলে যায়। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত হয় এই মূর্তি—কখনও জরাসন্ধ বধের মূর্তি—দুঃশাসনের বক্ষ রক্তপান—কখনও দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের কঠিন ভঙ্গিমায়, কখনও কীচক বধ, মাতা কুন্তী ও ভাইদেরকে কাঁধে নিয়ে জতু গৃহ থেকে পলায়ন ভঙ্গিমা কিংবা ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তিতে এই দেবতাকে দেখা যায়। পুজোর শেষে এই মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। ঐভাবে সারা বছর দাঁড়িয়ে থাকে এবং রোদ বৃষ্টিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যায়। ভীমের ভিন্ন নাম প্রচলিত আছে—হুড়া ভীম, ভীম সেন, হালুয়া ভীম, ভীম চাষী।

পুজক ঃ

মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ভীম ঠাকুরের পুজার আয়োজন করে। ভীম পুজো সর্ব্বক্ষেত্রেই সার্ব্বজনীন হয়। বৎসরে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় ভীম পুজো। কোন ক্ষেত্রেই নিত্য পুজার ব্যবস্থা নেই। বাগদী, চাষী, মাহিষ্য সম্প্রদায় ভীমের পুজক। এখন ব্রাহ্মণ দিয়ে পুজো করান হয়।

পূজার নৈবেদ্য ঃ

গোটা টাটকা গুড়ম আলু বা রাঙালু এবং ছোলা ভীম ঠাকুরের প্রিয় নৈবেদ্য। কিছু গুড়ম আলু বা রাঙালু সেদ্ধ করেও দিতে হয়। এছাড়া বাতাসা, চিঁড়ে, শাঁকালু, আপেল, খেজুর ও মিষ্টান্ন নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পূজার মন্ত্র ঃ

ওঁ ভীম সেন মহাবীর মহাবিষ্ণু প্রসাধকঃ
ত্রাহিমাং বীর বীরেশ ভীম সেন নমস্তুতে।
ভীমা কুন্তি সুতং গদা যুত যুতং
ক্রোধদ্বিতং ভীষণং অর্জুনং নরপুঙ্গবমুর হরো
যস্য ক্ষিপ্তেন শরেন পাতাল ভাগীরথীং গঙ্গা
পুত্র মুখে পতন মুমূর্ষু সময়ে ত্বং কৃষ্ণ মিত্র ভজে।

পূজার উদ্দেশ্য ঃ

শক্তির কামনা, সুফসল এবং "মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ দানের জন্য" ১ এই পূজো করা হয়ে থাকে।

কিংবদন্তী ঃ

১. কুন্তী মাঘ মাসের শুক্ল একাদশী পালন করবেন। কিন্তু প্রচণ্ড শীত। পুকুরের জল ঠাণ্ডা। কুন্তী স্নান করতে পারছিলেন না। পাশের ক্ষেতে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছিলেন ভীম। অবস্থা দেখে তিনি ক্ষেত থেকে উঠে এলেন। লাঙলের ফাল গরম করে পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিলেন। তাতে পুকুরের জল গরম হোল। কুন্তী স্নান করে একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই থেকে এটি ভীম একাদশী নামে পরিচিত।

২. রামেশ্বরের শিবায়ণে উল্লেখ আছে শিব ভীমকে সঙ্গে নিয়ে দেবীচকে চাষাবাদ করতে যান। উদ্দেশ্য দারিদ্র্য মুক্তি। শিবের সহকারী এবং হালুয়া (যে লাঙল ধরে ভূমি কর্ষণ করে) হলেন ভীম।

৩. মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভীম প্রথম পৃথিবীতে চাষাবাদ শুরু করেছিলেন। তাই এটি ভীম একাদশী।

বিভিন্ন গবেষক সংগৃহীত আরও কিছু লোকবিশ্বাস :

মেদিনীপুরের ভীমের পূজার ব্যাপক প্রচলনের কারণ হিসেবে কিছু তথ্য গবেষকগণ সংগ্রহ করেছেন

১. গড়বেতার কাছাকাছি গণগণির ডাঙায় বক রাক্ষসের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল।

২. খড়্গপুরের কাছে হিড়িম্বা ডাঙা আছে—ওখানে অনার্য কন্যা হিড়িম্বার সঙ্গে ভীমের বিয়ে হয়েছিল।

৩. মেদিনীপুর শহরের গোপগৃহ—যা বিরাট রাজার গো-ধনের স্মৃতি বহন করে।

৪. মেদিনীপুর খড়্গপুর অঞ্চলে অজ্ঞাতবাসের সময়ে পাণ্ডবেরা বসবাস করত বলে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে।

৫. ভিকু নগর গ্রামে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের সময়ে ভিক্ষা করত বলেও কিংবদন্তী প্রচলিত।

ভীমের মূর্তি এবং কিংবদন্তী প্রমাণ করে ভীম মহাভারতের চরিত্র। কিন্তু লৌকিক কাব্য—ছড়া সংগীত থেকে প্রমাণ হয় ভীম চাষী। শিবের কৃষিকর্ম সহায়ক। এই বিরোধ কেন? তবে প্রকৃত অর্থে ভীম কে?

পূর্ব গবেষকদের ধারণা ঃ

১. ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর "লোক উৎসব এবং লোক দেবতা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে (পৃঃ ৪৭) বলেছেন—(ক) ভীম ক্ষেত্র রক্ষক, (খ) কৃষি সহায়ক শক্তি, (গ) বাঞ্ছিত বর্ষণের দেবতা।

২. তরুণ দেব ভট্টাচার্য তাঁর "পশ্চিমবঙ্গ দর্শন —মেদিনীপুর" (পৃঃ ৯৬) গ্রন্থে ভীমকে সহায়ক কৃষি দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন।

পর্যালোচনা ঃ

ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তীর তৃতীয় মতটিকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে নেওয়া যাচ্ছে না। আমরা "ক্ষেত্র নিরীক্ষার জন্য প্রতাপপুর, রঘুনাথবাড়ী, সাহড়দা, চণ্ডীপুর এবং পসং, ছোটখেলনা ইত্যাদি স্থানে ঘুরেছি—অন্বেষণ করেছি। কিন্তু ভীম পূজার সঙ্গে বর্ষণের কোন যোগাযোগের কামনার কথা জনমানস থেকে পাওয়া যায়নি।

মন্তব্য ঃ

যেহেতু ভীম মূর্তি জলে ফেলে দেওয়া হয় না এবং লোকবিশ্বাস ভীম দাঁড়িয়ে ক্ষেত্র পাহারা দেয় সারা বছর, সেহেতু এঁকে "ক্ষেত্র রক্ষক", "কৃষি সহায়ক" দেবতা রূপেই মেনে নেওয়া যেতে পারে। মহাভারতের অনুকরণে যে মূর্তি কিংবা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা উক্ত দেবতাকে জনপ্রিয় করার জন্যই প্রিয় মহাভারতের প্রিয় বিস্ময়কর চরিত্রটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভীম প্রকৃত অর্থে "শক্তি"র প্রতীক যা কৃষিতে উন্নতি করতে পারে —ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে পারে। এই পূজার প্রচলন সম্ভবতঃ মহাভারত বাংলায় অনুবাদের পর হয়েছে।

হুদুম দেও

"হিল হিলাচ্ছে কমরটা মোর
শির শিরাচ্ছে গাও,
কোণ্টে কেনে গেলে এলা
হুদুমা দেখা পাও।"

—হুদুম দেওএর গান।

স্থান ঃ

বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে এবং কোচবিহার জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টির সময়ে রাজবংশী মেয়েরা হুদুম দেও-এর পুজো করে থাকেন। ফাঁকা মাঠে গভীর রাতে—এই পূজা হয়।

মূর্তি ঃ

হুদুম দেও-এর কোন বিশিষ্ট মূর্তি প্রচলিত নাই। তবে মাঠে একটি কলাগাছ পুঁতে রাখা হয়। ছাম ও গাইন দিয়ে তুষ কোটা হয়। পাড়ার সাতটি বাড়ী থেকে জল ভিক্ষা করে সংগ্রহ করা হয়। ঐ জল ও তুষ মিশ্রিত করে গোলা তৈরী করে ঐ গোলা উক্ত কলাগাছের গোড়াতে দেওয়া হয়। কলাগাছটি পূজার নির্দিষ্ট রাতে মাঠে পোঁতা হয়।

বিশেষ উপকরণ :

ফিঙে পাখি, ঘুঘু ও চিলের বাসা, মাটির ঘট, একটি কলাগাছ, ১৬টি পাকা বা কাঁচা কলা, কুলা, প্রদীপ, সিঁদুর, আম্রপল্লব ইত্যাদি উক্ত পূজার জন্য প্রয়োজন হয়।

নৈবেদ্য :

কলা, চিঁড়া, দই, গুড় বা চিনি কিংবা যেকোন মিষ্টান্ন উক্ত পূজার নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মন্ত্র ঃ

এই পূজার বিশেষ কোন মন্ত্র নেই। ভক্তিযোগে দেবতাকে নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়।

আচরণ বিধি ঃ

চৈত্র মাসের অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে হুদুম দেওএর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নাচ ও গান করে। উক্ত পূজার স্থানে পুরুষদের প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। পূজার সময়ে টিন বাজান হয়।

পূজার উদ্দেশ্য ঃ

অনাবৃষ্টির জন্য হুদুম দেওএর কাছে বৃষ্টির কামনা করা হয়ে থাকে। লোকবিশ্বাস হুদুম দেও বৃষ্টির দেবতা। নাচ ও গান গেয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতে পারলে দেবতার ইচ্ছায় তৃষিত মাটির বুকে বর্ষণ নেমে আসবে। আফ্রিকার "বা-কাউন-দে" (**Ba-Kaon-da**) গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের বৃষ্টির দেবতা "লেসা"-কে সমবেত ভাবে মাঠে বসে, গুণীনের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে সন্তুষ্ট করে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করে। ২

পূর্ব আফ্রিকার "থোঙ্গা" সম্প্রদায় তাদের বৃষ্টির দেবতা টি-লো (**T-Lo**)কে নাচের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করে। ঐ অনুষ্ঠানে নাচের সঙ্গে জল ছিটান হয়। ৩ এটি একটি "হোমিও-প্যাথী ম্যাজিক প্রক্রিয়া। এতে অংশ গ্রহণ করে যমজ সন্তানের মা।

পর্যালোচনা ঃ

বা-কাউন-দে এবং থোঙ্গা সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের পূজার পদ্ধতির একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নাচ ও গানের মাধ্যমে দেবতাকে সন্তুষ্ট করা—একটি আদিম প্রবণতা। এই দেবতার অন্তরালে আছে "অ্যানিমিজমের" ধারণা। প্রকৃতির অন্তরালে থাকা অলৌকিক শক্তিকে মানুষ ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে নিজের বশে আনার চেষ্টা করেছিল এক সময়ে। তখন বৃষ্টির দেবতা হিসেবে এই হুদুম দেওএর সৃষ্টি। এই দেবতার ক্ষেত্রেও টিন বাজিয়ে 'হোমিওপ্যাথী ম্যাজিক' প্রক্রিয়া প্রযোগ করা হয়, মেঘ গর্জনের। বিশ্বাস করা হয় তাতে বৃষ্টি নামবে তাছাড়া নাচ ও গানে দেবতাকে তুষ্ট করার ব্যাপারটিও ভিন্নদেশের মত এতেও আছে। এই দেবতার প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। ইনি একজন অনার্য গোষ্ঠীর লৌকিক দেবতা।

গান

হিল হিলাচ্ছে কমরটা মোর
শির শিরাচ্ছে গাও,
কোণ্টে কেনে গেলে এলা
হুদুম দেখা পাও ॥

পাটালি খানি পড়েছে খসিয়া
হুদুমা দেখা দেও গো আসিয়া।
আইসরে হুদুমা দেওয়া রসিয়া রসিয়া
তোর পদে মুই আছে রে বসিয়া ॥

ডিং সালি ডিং সালি কমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা।
করি কি মুই কায়বা কয়।
কোণ্টে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায় ॥

কার্তিক ঠাকুর

শেষ রাতি চণ্ডীমাও কার্তিক জন্ম দিল।
কার্তিক জন্ম দিয়া চণ্ডীমাও এর খুশী উপজিল।

—কোচবিহার. কার্ত্তিক পূজার গান।

স্থান ও দিনক্ষণ ঃ

মৈমনসিংহ, রংপুর, কোচবিহার, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে রাতে কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা হয়।

মূর্তি ঃ

পুরাণের শিবের পুত্ররূপে কার্ত্তিকের মূর্তিটি পশ্চিমবঙ্গে গড়া হয়। গায়ের রঙ লালচে হলুদ। মাথায় কোঁকড়ান চুল। সুন্দর প্রজাপতি ছাঁচ গোঁফ। দাড়িহীন সুন্দর মুখ মণ্ডল। ময়ূর আরূঢ় কার্ত্তিকের পরনে থাকে সাদা বা হলুদ ধুতি। নীল রঙের জামা, পীঠে তূণ, হাতে তীর ধনুক। এই মূর্তি খড়ের "ভুর"-এর উপর ন্যাকড়া জড়িয়ে তার উপর মাটি ও রঙ দিয়ে তৈরী করা হয়।

কোন কোন স্থানে কার্ত্তিক ঠাকুর সোলা দিয়ে তৈরী হয়। হাতির উপরে ময়ূর, তার উপর বসে থাকেন কার্ত্তিক ঠাকুর। কখনও "জোড় কাতি" অর্থাৎ এক জোড়া কার্ত্তিক ঠাকুরের মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয়। ৪

পূজক ঃ

বাংলা দেশে এবং উত্তর বাংলার কোন কোন জেলাতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় নারীরা কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা করত। পশ্চিমবঙ্গে পতিতা রমণীগণ এই পূজা করত। বর্তমানে ব্রাহ্মণ দিয়ে এই পূজা করান হয়।

নৈবেদ্য ঃ

চাল, কলা, নানান ফলমূল, বিবিধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি কার্ত্তিক ঠাকুরের নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দেশ্য :

প্রধানতঃ কার্ত্তিকের মত সুন্দর সন্তান কামনায় পশ্চিমবঙ্গে কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে।

বিশেষ রীতি :

কার্ত্তিক পূজার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। পাড়াতে কোন ব্যক্তির দীর্ঘদিন সন্তান না হলে পাড়ার কিছু ব্যক্তি গোপনে কার্ত্তিক মূর্তি তৈরী করে অপুত্রক দম্পতির বাড়ীতে কার্ত্তিক সংক্রান্তির আগের রাতে দিয়ে আসে। ভোরে উক্ত দম্পতি উঠানে কার্ত্তিক দর্শন পায় এবং পূজার আয়োজন করেন। উক্ত দম্পতিকে পর পর তিন বছর কার্ত্তিক পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। লোকবিশ্বাস এভাবে পূজা করলে সন্তান হীনার সন্তান লাভ হবে। কার্ত্তিক পূজার জন্য পতিতালয়ের কিছু মাটি নিয়ে আসতে হয়।

বিশেষ অনুষ্ঠান :

কার্ত্তিক পূজাকে কেন্দ্র করে "কার্ত্তিক লড়াই" এর উৎসব হয়ে থাকে বিভিন্ন স্থানে। তাতে পুতুল তৈরী করে একটিকে রাজা ও অন্যটিকে রাণী রূপে চিহ্নিত করা হয়। বা রাণীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রথাকৃতি বস্তুর উপর রাখা হয়। নীচে কার্ত্তিক কর্তৃক অসুর নিধনের বীরত্ব স্মারক কিছু পুতুল রাখা হয়। তারপর শোভাযাত্রা করে নগর কিংবা গ্রামের পথে যাওয়া হয়। কার্ত্তিকের বীরত্বব্যঞ্জক প্রচারের জন্য এর নাম কার্ত্তিক লড়াই।

বিশেষজ্ঞের ধারণা :

শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই উত্তর ও পূর্ব বাংলার কার্ত্তিককে "শস্য রক্ষক" দেবতা বলে চিহ্নিত করেছেন—তাঁর অভিমত পশ্চিমবঙ্গে ভিন্ন উদ্দেশ্যে কার্ত্তিকের পূজা হয়।

পর্যালোচনা :

পশ্চিমবঙ্গে কার্ত্তিকের "শস্য রক্ষক" রূপের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য আশুতোষ বাবুর শস্য রক্ষা বিষয়ক সংগৃহীত গানগুলি

চিত্তাকর্ষক। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র সন্তান কামনায় কার্ত্তিক ঠাকুরের পূজা করা হয়। তবে পুরাণের কার্ত্তিকের সঙ্গে সাদৃশ্য আমাদের বিশেষ চিন্তার উদ্রেক করে। কার্ত্তিক পুরাণে দেবসেনাপতি। সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন দক্ষতার পরিচয় সেখানে নেই। তবে কেন কার্ত্তিকের কাছে সন্তানের কামনা করা হয়?

মন্তব্য ঃ

আসলে কার্ত্তিকের বীরত্ব এবং সৌন্দর্য খুবই জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় আধারকে লোকসমাজ দেবতার আসনে বসিয়েছে। "হোমিও-প্যাথী ম্যাজিক" অনুসারে একটি বস্তু (কার্ত্তিক) সামনে রেখে অনুরূপ একটি সন্তান কামনা (লাইক প্রডাকট্ লাইক) নীতি শেষ পর্যন্ত কার্ত্তিককে দেবতায় রূপান্তরিত করেছে। ইনি পুরাণের দেবতা নন। ইনি জাগ্রত লোক মানসের সন্তান কামনার বিগ্রহ মাত্র। দেবতাটি আর্য আগমনের পরবর্তী কালের বলেই মনে হয়।

কার্ত্তিক পূজার গান ঃ

শেষ রাতি চণ্ডী মাও কার্ত্তিক জন্ম দিল।
কাতির জন্ম দিয়া চণ্ডীমাও-এর খুশী উপজিল ॥
কাজরী আলো ধাইরে।
কাতিরে কাতি তোর মাতা বানাইল কোন জনে ॥
আনু জনমে নারিকল বিলাই চং।
মাতা বানাইচে বাসুদেবে ॥
জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে।
কাতিরে, কাতিরে তোর বুক বানাইচে কোন জনে ॥
—বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত রত্নাকর—আশুতোষ—১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬

কালাকাতর বুড়ি

কালিদানের কালাকাতর প্রণাম করি মা
অভাজনের দুঃখ হরে সুখ দিয়ে যা ॥
—কালাকাতর বুড়ির গান

স্থান ঃ

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার কালিদান গ্রামে একটি জাম গাছের তলায় দেবী বাস করেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বাকসী নদীর কাছাকাছি এই দেবী থাকেন।

মূর্তি :

দেবীর কোন বিশেষ মূর্তি নেই। জাম গাছের তলায় একটি চান পাথর। তার গায়ে সিঁদুরের অনুলেপ। পাথরটির তিন ভাগ মাটিতে ঢাকা রয়েছে। আনুমানিক আড়াইশ বছর আগে থেকে দেবী ওখানে রয়েছেন।

পুজক ও দিনক্ষণ ঃ

স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এঁর পূজা করে থাকেন। সপ্তাহের সবদিন দেবীর পূজা করা যায়। নিত্য পূজা প্রচলিত নাই। মকর সংক্রান্তিতে মকর দেওয়া হয় ও বিশেষ পূজা করা হয়।

উপকরণ ঃ

বেলপাতা, জবাফুল, সিঁদুর, ঘি ইত্যাদি প্রয়োজন হয় দেবীর পূজায়।

নৈবেদ্য ঃ

যে কোন মিষ্টান্ন দেবীর পূজায় ব্যবহৃত হয়। দেবীর প্রিয় খাদ্য ক্ষীর ভোগ (চাল+চিনি বা গুড় জলে সেদ্ধ করে প্রস্তুত)

মন্ত্র ঃ

ওঁ বন্ধুক জবা কুসুমাং ভাসাং পঞ্চ মুণ্ডাধিবাসিনীং
স্ফুরচন্দ্র কলারত্ন মুকুটাং মুণ্ডমালিনীং
ত্রিনেত্রাং রক্ত বসনাং পীনোমত ঘট স্তনীং
পুস্তক ব্রাহ্ম মালঞ্চ বরদক্ষ ভয়াং ক্রমাৎ
ধতীং স্মরণেমিত্যং মন্ত্ররাস্নায়ম নিতাম
হ্রীং চণ্ডী কায়ৈ নমঃ

(পূজকের কাছ থেকে সংগৃহীত মন্ত্রের ভুল উচ্চারণগুলিও দ্রষ্টব্য)

পূজার উদ্দেশ্য :

যে সমস্ত কারণে দেবীর পূজা করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হোল—

(১) হারিয়ে বা চুরি হয়ে যাওয়া বস্তু ফিরে পাওয়ার আশায়।

(২) অলস বলদ লাঙল না করলে।

(৩) যে কোন রোগ প্রতিকারের আশায়।

(৪) সন্তানহীনার সন্তান কামনায়।

(৫) গাভীর গো-বৎস কামনায়।

(৬) বাকসী নদী দিয়ে খড় নৌকা গেলে দেবীকে খড় দান করতে হয়—সুষ্ঠুভাবে নৌকা পরিচালনার জন্য এবং বলতে হয় কালা কাতর মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করে হরি হরি বল।

(৭) আখ মাড়াই-এর সময় যাতে বৃষ্টি না হয় সে জন্য প্রার্থনা করা হয়।

প্রচলিত কিংবদন্তী :

স্থানীয় বাকসী নদী পূর্বে খুব প্রশস্ত ছিল। বড় খড়ের নৌকা এবং জাহাজও যাতায়াত করত ঐ নদী দিয়ে। এক সময় ডিঙ্গল গ্রামের হাটে যেতে যেতে এক সাহেবের জাহাজ ডুবে যায়। তা খুঁজতে তিনি অনেক চেষ্টা করেন। ঐ সময় লাগাবাবাজী নামে এক সাধু আসেন, তিনি বাকসীর দক্ষিণ দিকে বর্তমান কালা কাতর বুড়ির অবস্থান ক্ষেত্রটি মাটি খুঁড়ে বের করেন এবং বলেন এই দেবীকে মানৎ করলে হারানো বস্তু পাওয়া যাবে। এই কথা বলে তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে যান। ৫

সিদ্ধান্ত :

দেবীর পূজার মন্ত্র থেকে জানা যায় ইনি চণ্ডীরই রূপান্তর। চণ্ডী বনদেবী বটে। তাঁর নিকট হারানো বস্তু কামনা করাই স্বাভাবিক। তবে কৃষি বিষয়ক কামনা কৃষি প্রধান স্থানের জন্যই সম্ভব হয়েছে একই ভাবে নৌকার ব্যাপারটিও ঘটেছে যেহেতু পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বাকসী নদী। বাঙালীদের সাধারণ নিয়মই হোল পথে যেতে যেতে যেখানে যত দেবদেবী থাকেন সকলকেই নমস্কার জানান। সেই ভাবে এই কালা কাতর বুড়ির কাছেও বিভিন্ন বস্তুর কামনা করা হয়।

মকরেতে পূজা দিব সনকা মাই-র থানে
ও দিদি চাল কুটিব ফুল তুলিব চল না সিখানে ॥

—সনকার গান

স্থান

মেদিনীপুর-গোয়ালতোড় বাসে প্রায় দু'ঘণ্টার পথ গোয়ালতোড়। ওখান থেকে সাত মিনিট হাঁটলে কুচলাশুলী গ্রাম। ওখানে সনকা দেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি আনুমানিক ৭০০ বছরের পুরানো। মন্দিরটিতে উড়িষ্যার স্থাপত্য রীতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। মন্দিরের মুখ পূর্ব দিকে। সামনে একটি নাট মন্দির। জনৈক ভক্ত মামলায় জয়লাভ করে এই নাট মন্দির তৈরী করে দেন। তবে মূল মন্দিরটি কে তৈরী করেন এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া গেল না। এ ব্যাপারে ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। মন্দিরের পিছনে একটি বৃহৎ পুকুর। দক্ষিণ পূর্ব কোণ দিয়ে একটি সর্বক্ষণের জলস্রোত পুকুরে পড়েছে। পুকুরের বিস্তৃতি পাড় সমেত প্রায় তিন একর। মন্দিরের মধ্যে দেবী বিগ্রহের ঠিক নিচ থেকে একটি সুড়ঙ্গ পথ নেমে গেছে। কিংবদন্তী আছে ঐ গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ পুকুর অতিক্রম করে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে। বর্তমানে একটি সাদা পাথরের প্লেট দিয়ে ঐ সুড়ঙ্গ পথটি ঢেকে রাখা হয়েছে। অনুমান করা হয় মন্দিরটি এককালে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। বিপদের সময়ে তারা ঐ গুপ্ত পথ দিয়ে অন্যত্র সরে পড়ত।

মূর্তি ঃ

দেবী বিগ্রহটি কালো পাথরের মাতৃমূর্তি। দেবীর চার হাত। পায়ের কাছে দক্ষিণ ও উত্তর মুখে একটি করে বাঘ মূর্তি আছে। দেবীর অধিষ্ঠান পূর্ব মুখে।

পুজক ঃ

দেবীর বর্তমান পূজক বাদল পূজারী, বয়স ৪৩ বছর। এঁর পূর্বের পদবী ছিল লোহার। জাতিতে এরা মাজি। পূজকদের মৃত-অশৌচ হলে দশদিন মন্দির বন্ধ থাকবে। ব্রাহ্মণ দিয়ে কোন পূজো চলবে না।

পুজার তিথি ও নৈবেদ্য ঃ

সনকা দেবীর নিত্য পূজো প্রচলিত। প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত দেবীর পূজো হয়। বছরে একদিন দেবীর অন্নভোগ প্রচলিত। তিথিটি হোল আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী তিথি। অন্য সব দিন আতপ চালের নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় মায়ের উদ্দেশ্যে। এছাড়া মায়ের প্রিয় নৈবেদ্য চিনি বাতাসা, গুড়। পৌষ মাসের মকর সক্রান্তির দিন ছাড়া অন্য সব দিন বলি প্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ ছাগল, ভেড়া, মহিষ, মুরগী, কুমড়া, আখ প্রভৃতি দেবীর সামনে বলি দেওয়া হয়। নিত্য সন্ধ্যা আরতিরও ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন প্রচুর ভক্ত সমাবেশ ঘটে।

মন্ত্র ঃ

অনেক অনুসন্ধান করেও দেবীর পুজোর মন্ত্র সংগ্রহ করতে পারা গেল না। তবে পূজক শ্রীবাদল আমাদের জানালেন ব্রাহ্মণ্য মন্ত্র অনুসরণ করা হয়। অন্যান্য সব ভক্তি যোগেই সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

পরীক্ষায় পাস, মামলায় বিজয় লাভ, সন্তান কামনা ও রোগ ব্যাধি মুক্তির কামনায় দেবীকে পূজো দেওয়া হয়।

মনের বাসনা পূরণ হবে কিনা তা জানার উপায়ও প্রচলিত আছে— প্রথমে ভক্ত পূজকের সামনে গিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে মনে মনে চিন্তা করতে থাকে তার কামনার কথা। তখন পূজক দেবীর মাথায় একটি ফুল রাখেন। যদি ফুলটি নীচে পড়ে যায় তখন পূজক ঘোষণা করেন "তোমার বাসনা পূর্ণ হবে"। ফুল যদি না পড়ে তবে সব কিছু নঞর্থক হিসেবে ধরা হয়। ভক্তের চোখ বন্ধ থাকায় ফুল পড়া না পড়া ইত্যাদিতে পূজকের ভূমিকা থেকেও যেতে পারে।

কিংবদন্তী ঃ

দেবীর পুজোর ব্যাপারে এক চমৎকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দিরের উত্তর দিকে একটি মাটির উঁচু বেদী আছে।' তার পাশে একটি

প্রাচীন তেঁতুল গাছ হেলে পড়েছে। প্রতি বছর দুর্গা অষ্টমীতে ঐ বেদীর চার পাশে অসংখ্য ভক্তের ভিড় হয়। ঐ বেদী থেকে কচি বেলপাতা আপনা থেকেই উঠে আসে। তারপর ঐ বেলপাতা দিয়ে দেবীর পুজো শুরু হয়। আশ্চর্য ব্যাপার ঐ বেদীর উপর বা কাছাকাছি কোন বেল গাছ নেই।

বেলপাতা আপনা থেকেই মাটির ভেতর থেকে উঠে আসে বলে ভক্তের বিশ্বাস আরও জমাট বেঁধেছে। মনে হতে পারে এই লোক-বিশ্বাসটির অন্তরালে আছে আদিম 'এ্যানিমিজম' বা সর্বপ্রাণবাদ। কিন্তু এ ব্যাপারে বহু অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এটি পুজকদের কারসাজি। কিন্তু ভক্তদের তাতে কিছুই যায় আসে না।

মন্তব্য ঃ

দেবীর পুজোয় যে 'ব্রাহ্মণ্য মন্ত্র' ব্যবহৃত হয় তা উত্তর কালের সংযোজন। যদিও মন্ত্রের ব্যাপারটিতে 'ব্রাহ্মণ্য মন্ত্র' সত্যই ব্যবহৃত হয় কিনা সন্দেহ আছে। আদিম অবস্থায় মাজি সম্প্রদায় শুধুমাত্র ভক্তি যোগেই দেবীর পুজো সমাধা করতেন। এই দেবী কিন্তু অনার্য লৌকিক দেবী, বর্তমানে মিশ্র সংস্কৃতির গুণে (আর্য + অনার্য) ইনি অন্যান্য সম্প্রদায়েরও দেবী হয়ে উঠেছেন।*

সন্ন্যাসী ঠাকুর

মেদিনীপুর জেলায় গোয়ালতোড় থেকে পিড়াকাটার দিকে যে পাকা রাস্তা চলে গেছে তাতে গোয়ালতোড় থেকে তিন কিলোমিটার দূরে প্রাচীন অশথ গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে সন্ন্যাসী ঠাকুর অবস্থান করেন। স্থানীয় ভক্তদের ধারণা আনুমানিক তিন শ' বছরের পুরাতন এই ঠাকুর।

গাছের তলায় কুড়ি পঁচিশ খানি হাতি ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য এগুলি মাটির। মাজি সম্প্রদায়ের লোহার

* তথ্য-সংগ্রহের সময় বাড়িতে থাকার সুযোগ দিয়ে সাহায্য করেছেন—শ্রীমদনমোহন সাহু, শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী সাহু। এঁদের মূল বাড়ী পিংলা থানার দণ্ডশিরা গ্রাম।

পদবী ধারীরাই এঁর পূজক। যে কোন ফুলে এঁর পূজা করা চলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রিয় বস্তু গাঁজা-কলকে এবং বাতাসা। ঠাকুরকে তুষ্ট করার জন্য ভক্তেরা এগুলি দেওয়ার মানসিক করেন। শরীরের যে কোন অসুখ সারানোর জন্য ঠাকুরের কাছে আবেদন জানান হয়। সাধারণতঃ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতেই এঁর পূজার দিন নির্দিষ্ট।

মাঘ মাসের পাঁচ তারিখে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। বিকেলে মেলা বসে। লাঠি খেলা হোল মেলার বিশেষ আকর্ষণ। কোন কোন বছর 'মুরগী লড়াই' হয়ে ওঠে বিশেষ দ্রষ্টব্য। ৬

শীতলাদেবী

"দেবী ক'ন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হৈল।
কোথা যাই কি করিব পরান বিকল ॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।
যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥
সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে শীঘ্র তুমি যাও ভূ-মণ্ডল ॥"
—শীতলা মঙ্গল, নিত্যানন্দ।

স্থান :

মেদিনীপুর, হাওড়া চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি জেলার মুখ্য লৌকিক দেবী বোধ হয় শীতলা। মেদিনীপুরে শীতলার প্রাধান্য সব থেকে বেশী। কোন কোন গ্রামের প্রধানা গ্রামদেবী এই শীতলা। চোখে পড়ার মত শীতলা মন্দির হোল মেদিনীপুরের রামচন্দ্রপুরে অবস্থিত মন্দির। গ্রামের মন্দিরে দেবী থাকেন। কোথাও গাছের তলায়ও দেবী থাকেন।

দেবীর জন্ম কথা :

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে শীতলা মঙ্গল কাব্যের খুব প্রচলন আছে। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা হলেন—নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, ক্ষেপুতের শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, অকিঞ্চন চক্রবর্তী ইত্যাদি। নিত্যানন্দ,

দেবীর জন্ম কথা নিম্নভাবে বলেছেন—নহুষ রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের আগুন নিভে গেলে সেই যজ্ঞ কুণ্ড থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে মাথায় কুলা ধারণ করে উঠে এলেন। ব্রহ্মা ঐ সুন্দরীর নাম দেন শীতলা। কারণ তিনি যজ্ঞ শীতলের কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্করের কাহিনীতে দেখি—ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা নির্মিত কুণ্ডে যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ কুণ্ড থেকে শীতলা আবির্ভূত হন। বামকাঁখে পূর্ণ কুম্ভ, দীর্ঘকেশ, গর্দভারূঢ়া এই দেবী। শিব এঁকে পালন করেন। ঘণ্টাকর্ণ মুনির সঙ্গে বিবাহ হয়। ইনি চৌষট্টি রকম বসন্ত নিরাময়ের দায়িত্ব পান—যেমন সূর্যমণি বসন্ত, নীলবসন্ত, মুগাই বসন্ত, রক্তাবসন্ত, ডুবুরে বসন্ত, বাঁশমুড়া বসন্ত ইত্যাদি।

মূর্তি ঃ

দেবীর মূর্তি পূজা হয়। কোন কোন স্থানে মাটির তৈরী কয়েকটি হাতি থাকে (মাদপুরঘাট মেদিনীপুর) কোথাও মাটির বা পেতলের কলসীর উপর মাটির বা পেতলের মুখমণ্ডল স্থাপন করা হয়। কলসীর উপর পরান হয় লাল শাড়ী, মুখমণ্ডল নানান অলংকারে সজ্জিত। হার, নথ, মাথার সিঁথি ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয় অলংকার হিসেবে (যেমন—সাহড়দা, সিঁতিবিন্দা, মেদিনীপুর) ঐ অলংকার কোন কোন স্থানে সোনার তৈরীও হয়। কোথাও বা পাথর খোদাই করা মাতৃমূর্তি চোখে পড়ে। শরীরে তার সিঁদুরের অনুলেপ, চোখ দুটি সাদা পাথরের, মাঝে কালো চোখের তারা, সর্বাঙ্গ লাল কাপড় আবৃত। হাওড়া শহরে চিন্তামণি দে রোডে দুটি বিশালাকৃতি শীতলা মূর্তির পূজা হয়। উচ্চতায় এঁরা ১২—১৪ ফুট পর্যন্ত হয়। গায়ের রঙ সবুজ ও সাদার মিশ্রণ। গাধার পীঠে দেবী বসে থাকেন ডান হাতে থাকে ঝাঁটা, বাম কাঁখে পূর্ণ কুম্ভ। কোথাও আবার দেবীকে ঘট স্থাপন করে পুজো করা হয়। ঘটের পেছনে থাকে দেবীর কাঁচ বাঁধান ছবি।

পূজার উপকরণ ঃ

বেলপাতা, যে কোন লাল ফুল, সিঁদুর, দুর্বা দিয়ে তৈরী সুতোর মালা, শোলার তৈরী চাঁদমালা ইত্যাদি দেবীর পূজার উপকরণ।

নৈবেদ্য :

আতপচাল, কলা, যে কোন মিষ্টান্ন, যে কোন ফল দেবীর নৈবেদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে শোল মাছ দেবীর খুব প্রিয় খাদ্য। এছাড়া যে কোন রান্না করা মাছ দেবীর পূজায় ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থানে মুরগী বা ছাগল বলী দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে কালো রঙ নিষিদ্ধ।

পূজার নিয়ম :

পূজককে পূজার পূর্বদিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। পূজার দিন নিত্যকর্ম সমাপন করে দেবীর 'স্বস্তিবাচন' করা হয়, তারপর অর্ঘ্য প্রদান করা হয়, তারপর আবাহন-অধিবাস-আমন্ত্রণ। কোন কোন স্থানে শীতলা পূজার আগে "বসুমাতা ও ধর্ম দেবতার মন্ত্র পড়া হয়।"

মন্ত্র :

শীতলা পূজার মন্ত্র লক্ষ্য করার মত - সহজভাবে দেবীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়—যেমন—তোমার পূজো দিচ্ছি মা। তুমি সন্তুষ্ট হয়ো, যেন কোন আগড়-বাগড় না হয়। তোমার বলির জন্য পাঁঠা দেব মুরগী দেব। ৭ এছাড়া আমরা একটি মন্ত্র সংগ্রহ করেছি সাহড়দা গ্রামের শ্রীঅমল কুমার রায় মহাশয়ের কাছ থেকে। মন্ত্রটি নিম্নরূপ —

শীতলাং গন্ধর্ভারূঢ়াং শ্যামবর্ণাং।
সুলোচনাং দক্ষিণে মার্জনী মুষ্ঠ্যাং ॥
বামে কলসী ধারিণী দিগম্বরীং।
দ্বিভুজানাঞ্চ নানা অলংকৃত ভূষিতাম।
শীতলাদেবী নমঃস্তুতে।

পূজার উদ্দেশ্য :

শত্রুভয় নাশ, বসন্ত হাম নিরাময়, মিত্রলাভ আয়ুবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে এই দেবীর পূজা করা হয়। তবে চৌষট্টি রকমের বসন্ত প্রতিরোধ করার অলৌকিক ক্ষমতা দেবীর আছে বলে লোকবিশ্বাস আছে।

মন্তব্য ঃ

শীতলা লৌকিক গ্রাম দেবী। মনে হয় শিব, ব্রহ্মা ইত্যাদির কাহিনী সংযোজন করে দেবীকে জাতে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। বসন্ত রোগের ভয়েই মানুষ এই দেবীর পূজা দেয়। দেবীর স্বভাবও কোপন স্বভাবা। মনে হয় আদিম হিংস্রতার মানসিকতা দেবীর মধ্যে আছে। বসন্ত রোগের বীভৎসতা ভয়ংকর যন্ত্রণা ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে দেবী পূজা সংগ্রহ করেছেন--এই হিংস্রতা দেবীকে প্রাচীন করে তুলেছে। সমাজের আদিম অসহায় মানুষের কাছে যে দিন চিকিৎসা পদ্ধতি চালু ছিল না সেই সময়ে এই দেবীর সৃষ্টি। তারপর ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরা এই দেবীর পূজা কুক্ষিগত করে নবরূপে একে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে।

ঘেঁটু

ঘেঁটু আয় দোরে, খোস বালাই নিয়ে যা দূরে।
ঘেঁটু আয় দৌড়ি, হাতির কাঁধে চড়ি ॥

—ঘেঁটুর গান।

পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, হাওড়া, বর্ধমান চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণাংশ) বীরভূম হুগলী প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই দেবতাটির সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি চর্ম রোগের দেবতা। এঁর ভক্ত অধিকাংশ অঞ্চলে অল্প বয়স্ক কিশোর কিশোরীগণ। তবে কোন কোন অঞ্চলে গ্রামের বয়স্কা মহিলাগণ ঘেঁটুর ব্রত করেন। কোথাও বা ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করেন এই পূজার।

চৈত্র মাসের চতুর্দশীতে কাঠের মূর্তি গড়ে ঘেঁটু পূজা হয়।৮ অন্য মতে ফাল্গুন সংক্রান্তিতে এনার পূজার তারিখ নির্দিষ্ট।৯ তবে কাঠের মূর্তি আমাদের চোখে পড়েনি। সাধারণতঃ ভাঙা হাঁড়ি (যার নিচের অংশটি ভাল) উল্টে দিয়ে তাতে পিটুলি কিংবা সাদা রঙ, অভাবে চুন দিয়ে মনুষ্য মুখাকৃতি একটি প্রতীক তৈরী করে রাস্তার তে-মাথা বা চৌমাথার ধারে এঁর পূজা করা হয়।

পূজার তিন দিন আগে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ঘেঁটুকে দোলায়

চড়িয়ে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী চাল ডাল ইত্যাদি "মাগণ" করে এবং নানান গীতধর্মী ছড়া বলে। আবার গানও গায়। তিনদিন এইরূপ করার পরে ঐ চাল ডাল দিয়ে তারা প্রীতিভোজ করে।

পুজোর নৈবেদ্য বলতে—চাল, ডাল, গুড় কোথাও বাতাসা কিংবা চিনিও ব্যবহৃত হয়। এই পুজোয় কোন মন্ত্র পাওয়া গেল না। সাধারণতঃ মন্ত্রের বদলে ছড়া কাটা হয়। কোন কোন স্থানে শুধু ভক্তি যোগে ফুল নিবেদন করা হয়। পুজার শেষে লাঠি দিয়ে ঐ ঘেঁটু প্রতীকের হাঁড়িটি ভেঙে ফেলা হয়।

ঘেঁটু আসলে ঘণ্টাকর্ণ। এঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটি হোল ঃ ঘেঁটু বিষ্ণু কর্তৃক অভিশপ্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেবকুমার। পরে ইনি পিশাচ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় ভয়ংকর বিষ্ণু বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। বিষ্ণু নাম যাতে কানে প্রবেশ করতে না পারে তাই সব সময় ইনি কানে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন।

অনুমান করা যেতে পারে ইনি একজন অনার্য দেবতা। অতীতে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষেরা যখন চর্মরোগের শিকার তখন তাঁদের হাতে কোন চিকিৎসা বিদ্যা ছিল না। তখন চর্মরোগের নিরাময়ের জন্য তাঁরা এই দেবতার সৃষ্টি করেছেন ভয়ে। ঘেঁটুর প্রতীকের মধ্যে সেই আদি-মতার চিহ্ন স্পষ্ট বলেই মনে হয়।

ঘেঁটুর গান ঃ

ছড়ার যে ক'টি বৈশিষ্ট্য থাকে তার প্রতিটিই প্রায় এই গানে দেখা যাবে। আসলে শিশু মনে এক ছবি থেকে অন্য ছবিতে চলে যাওয়ার দ্রুততা এই গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—

ঘেঁটু আয় দোরে
খোস বালাই নিয়ে যা দূরে
ঘেঁটু আয় দৌড়ি
হাতির কাঁধে চড়ি।
হাতিরে গুড়গুড়ি বাজে
তা শুনতে বলুই নাচে
তুলরে জিও কান্দি।

রাম লক্ষণ মন থোক বান্দি
থোক থোক তিন থোক
চিলে নিলে এক থোক
ওরে চিল নড় চড়।
দাঁড় করা পটুঙ্গা সুতো
মাছ মেরেছি ঈষের গুঁতো।
হরে ছোঁড়া প্রকাণ্ড
ঈষ লাঙল বার কর।
এ হাল কোথাকে যায়।
রসুন হাটাকে যায়।
রসুন হাটায় কি কি বিকায়
মার মার খাণ্ডার বিকায়।
এই খাণ্ডার লোব
ভাসুর বন্ধক দোব।
ভাসুর ভাসুর দুনিয়া
কড়ি আনগা গুনিয়া।
কড়া আনতে কড়ি ছোটে
রাজার ঘরে লেঠু উঠে ॥
নেই কি? দেয় কি?
কড়াই ছুটিয়া ভাই এই যায় ওই
ধোপার ঘাটে জল খায়।
ধোপার ঘাটে জল খেয়ে
মোষ পড়লো দুরুম দিয়ে
ঘেঁটু যা…দূরে। ১০

বলদ বাহিনী

মেদিনীপুর জেলায় গোয়ালতোড় থেকে ছ' কিলোমিটার দূরে বুলানপুর গ্রাম। এই গ্রামে বলদ বাহিনী দেবীর থান। দেবীর পূজক মাল সম্প্রদায়। ইনি মূলতঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবী বলে কথিত

কিন্তু স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ওঁর পুজো করেন। দেবীর প্রাত্যহিক পুজো প্রচলিত আছে। দেবীর মূর্তিটি শুধুমাত্র পিতলের তৈরী মুণ্ড। পাশে আছে ছোট ছোট অসংখ্য মাটির তৈরী হাতি ঘোড়া। দেবী বর্তমানে মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করেন। মন্দিরের পাশেই ঘন জঙ্গল। মন্দিরটি ১৫-২০ বছর আগে এক ভক্ত কর্তৃক নির্মিত হয়। পূর্বে দেবী ঐ জঙ্গলের মধ্যেই থাকতেন।

মন্দিরের পাশেই এক বেল গাছ আছে। শুধুমাত্র ঐ বেল গাছের পাতাতেই দেবীর পুজো হয়। অন্য ফুল বা বেল পাতায় দেবীর পুজো হয় না। অধিকাংশ সময়ে দেবীকে গরু বা মহিষের দুধে স্নান করান হয়। অভাবে মন্দিরের নিকটে প্রবাহিত তমাল নদীর জলে স্নান করান হয়। তবে দুধ স্নানই দেবীর প্রিয়।

প্রিয় ও প্রধান নৈবেদ্য মহুয়ার মদ এবং তামাক পাতা। মুরগী ও ছাগল বলিদানও প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ গরু মহিষ বনের মধ্যে হারিয়ে গেলে মদ ও তামাক পাতার মানৎ করে দেবীকে স্মরণ করা হয় এবং দেবীর পুজকের কাছে গেলে তিনি গণনা করে কোন বনে উক্ত গরু বা মহিষ আছে তা নির্ভুল ভাবে বলে দেন।

দেবীর বাৎসরিক মেলা হয় পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন। এই মেলার নাম "এখ্যান মেলা"। মেলা উপলক্ষে বহু নরনারীর ভিড় হয়। নাচগান, লাঠিখেলা, মুরগী লড়াই মেলার বিশেষ আকর্ষণ।

বলদ (বৃষ) বাহন যদি শিব হয় তবে বলদ বাহিনী কি দুর্গা? কিন্তু পুজার প্রকৃতি প্রকরণে দুর্গার কোন প্রমান মেলে না। তামাক পাতা এবং মদ খাওয়ার মধ্যে প্রাচীন আদিবাসী মননের পরিচয় প্রকাশিত। এঁকে আদিম বনদেবী বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। "চণ্ডীমঙ্গলে" চণ্ডী একদা বনদেবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। অরণ্য-চারী মানুষ গরু মহিষের সন্ধান পাওয়ার জন্য বলদ বাহিনীকে পুজো দিত, তুষ্ট করার চেষ্টা করত। সেই আদিম বনদেবী আজও স্ব-মহিমায় বিরাজিতা। ইনি বনদুর্গা, বনচণ্ডী ইত্যাদির পরিবর্ত্তিত রূপ।

ষষ্ঠী বুড়ি

বন্দিমাতা ষষ্ঠী তুমি
উরগো মরত ভূমি।
কবি কণ্ঠে কর বরদান।
হরিহর দেব বণ্ডা বর্ণিয়ে পরে তোমা
দেবগণ ধেয়ান পরে।
যে বাক্য বলিবে তুমি, সে বাক্য বলিব আমি
দোষ গুণ সকলি তোমার।

—ষষ্ঠীর বন্দনা গান

স্থান ও দিনক্ষণ

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশের কিছু কিছু স্থানে ষষ্ঠী বুড়ির পুজো হয়ে থাকে। এঁর ভিন্ন নাম সুতিকা ষষ্ঠী। সাধারণতঃ সন্তান জন্মের ছ'দিন পরে একটি শুভদিন দেখে সুতিকা ষষ্ঠীর পুজো হয়। তবে যাদের পক্ষে ঐ সময় পুজো করা সম্ভব হয় না—তারা শিশুর অন্নপ্রাশনের আগের দিন ষষ্ঠী বুড়ির পুজো করে।

দেবীর বিবরণ :

দেবীর কোন নির্দিষ্ট মূর্তি আমাদের চোখে পড়েনি। তবে দেবী গৌরবর্ণা। নানা রত্ন অলংকারে দেবী ভূষিতা। পুজোর সময় একটি আদিস্তানা তৈরী করা হয়। তাতে চারটি কাঠির মাথায় তালপাতা ভাঁজ করে দিয়ে তীর তৈরী করা হয়। এটি কি অরণ্য সংস্কৃতির প্রতীক? যাইহোক ঐ আদিস্তানার মধ্যে নতুন শাড়ী রাখা হয়। আদিস্তানার সামনে অষ্টদল পদ্ম চিত্রিত করে তাতে চাল ভর্তি একটি কলসী বা ভাঁড় রাখা হয়। ঐটি দেবীকল্প। দেবীর বাহন বিড়াল।

নৈবেদ্য :

একুশখানি গুড় পিঠে, কিছু সাদা খই, সিমলাকুলের পাতা, ফলমূল, মিষ্টান্ন, চাল, কাঁঠালি কলা একছড়া ইত্যাদি।

উপকরণ :

সিঁদুর, হরিতকী, সুপারী, পাটের বিঁড়ে, ফুল-তুলসী, লোহার তৈরী লেখনী, একটি তালপাতা, ২৫টি পান, ২৫টি হলুদ শুঁটি। এতে ঘণ্টা বাজান নিষিদ্ধ।

মন্ত্র :

দ্বিভুজাং হেম গৌরাঙ্গিং
রত্নালংকার ভূষিতাং
বরদাং ভয়ং হস্তাচ
শরশ্চন্দ্র নিভাননম।
শীতবস্ত্র পরিধানাং
পিনোন্নত পয়োধরাম।
অংকা পীত শতাং ষষ্ঠী
ষষ্ঠী দেবী বিচিন্তয়েত। ১১

পূজার উদ্দেশ্য :

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার আছে ষষ্ঠী-বুড়ী সন্তান-সন্ততি উৎপাদনের দেবী। তাঁরই কৃপায় সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে। তাই পুজার মাধ্যমে তাকে তুষ্ট করে সন্তানের সুস্থ দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এবং আগামী সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানান হয়।

পুজক :

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরাই ষষ্ঠী বুড়ির পুজা করে থাকেন। তবে পূর্বে বাড়ীর বয়স্কা মহিলাগণ ষষ্ঠী বুড়ির পুজা করতেন।

মন্তব্য :

দেবী আদিম লৌকিক দেবী। লৌহ লেখনী এবং লেখার জন্য তালপাতা দেবীর প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করে। লৌহ যুগেই দেবীর সৃষ্টি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জী

১. বর্ণনাকারী—দীপক কুমার সামন্ত, ভরতচন্দ্র রাণা, রঘুনাথ বাড়ী, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

২. **F. H. Melland, In Witch Bound Africa (1923), Page-296.**

৩. **H. A. Junod, The life of South African Tribe (1912), Page-296.**

৪. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য —পৃঃ ২২১।

৫. বর্ণনাকারী –শ্রীনারায়ণচন্দ্র পাত্র, শ্রীতারাপদ পাত্র, শ্রীমতী মণিকা পাত্র –কালিদান, মেদিনীপুর।

৬. বর্ণনাকারী—নিরঞ্জন বিশাই, ধরমপুর, মেদিনীপুর।

৭. **The Lodhas of West Bengal (Festive Cycle) —Dr. P. K. Bhowmik (1963).**

৮. উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৮।

৯. লোক সংস্কৃতি বিচিত্রা—সনৎ মিত্র, পৃঃ ২৩৭।

১০. উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৯।

১১. বর্ণনাকারী—মদনমোহন মিশ্র—কালিমোহনপুর, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর (সংগ্রহের তারিখ—১০. ১১. ৮৮)

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা লোকসঙ্গীতে লোকসমাজ ও পরিবারের বিভিন্ন চরিত্র

কত হাজার বছর আগে যে আমাদের সমাজ ও পরিবার গড়ে উঠেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে একদিনে কোন সমাজ বা পরিবার গড়ে ওঠেনি। নৃতাত্ত্বিকদের মতে সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষদের সমাজও একইরকম ভাবে গড়ে ওঠেনি। মনে করা হয় "রক্তের বন্ধনে" আবদ্ধ ছোট ছোট জনগোষ্ঠীই ছিল আদিম সমাজ। সমাজই ছিল মানুষের "আদি প্রতিষ্ঠান"। বিবাহ প্রথা গড়ে তুলেছিল পরিবার। আবার পরিবার গড়ে তুলেছিল সমাজ। আদিম সমাজে একজন শক্তিমান পুরুষ এবং তার প্রতি অনুগত একাধিক নারী নিয়েই গড়ে উঠেছিল পরিবার। আদিম সমাজে মোটামুটি তিন রকমের বিয়ে প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ একটি পুরুষ ও একটি নারী মিলে একপত্নী বিয়ে। দ্বিতীয়তঃ একটি পুরুষ এবং একাধিক নারী নিয়ে বহু পত্নীক বিয়ে এবং তৃতীয়তঃ একটি নারী এবং একাধিক পুরুষ নিয়ে বহুপতি বিয়ে।

আরও পরবর্তীকালে গঠিত হয়েছিল "বহির্বিবাহ" (Exogamy) এবং 'অন্তর্বিবাহ' (Endogamy)। এক টোটেম ভুক্ত মানুষ নিজ টোটেমের মধ্যে কন্যা বা বর সংগ্রহ করতে পারত না। তখন প্রয়োজন হোত 'বহির্বিবাহের'। যখন একই টোটেমের মধ্যে মিলন সম্ভব হোত তখন তা ছিল অন্তর্বিবাহ।

সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন আদিম ধর্ম সমাজকে উন্নত করার চেষ্টা করেছিল। দুরকেইম মনে করেন—ধর্মের মূলে আছে মানুষে মানুষে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। ধর্ম ও বিধাতার মধ্য দিয়ে মানুষ চেয়েছে গোষ্ঠীগত ও সামাজিক ঐক্য। (নৃতত্ত্ব—ডঃ এবনে গোলাম সামাদ—পৃঃ ১২৩-২৪)

পরিবার বহু পূর্বে গঠিত হয়েছিল। এখনও পরিবার আছে। তবে নগর জীবনের প্রভাবে গ্রামীন যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে। লোক সমাজে পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে লোকসঙ্গীতে লোকসমাজের নানা অসঙ্গতির যে চিহ্ন প্রকাশিত হয়েছে তারও স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করা হবে বর্তমান অধ্যায়ে। লোকসঙ্গীত—প্রবাদ কথা, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লোকচরিত্র নানাভাবে ধরা পড়েছে। তবে প্রবাদ যেহেতু লোকচরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় সেহেতু লোকসঙ্গীতের পাশাপাশি লোকপ্রবাদগুলিও প্রয়োজনমত আলোচনা করা হবে।

১. মা বনাম স্ত্রী :

পরিবারে মা এবং স্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ের পর ছেলে মার দিকে কিছুটা অবহেলা দেখায়—বর স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করার দিকেই তার বেশী আগ্রহ, বাংলা প্রবাদে এ ব্যাপারে যথেষ্ট স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

(ক) মায়ের পেটে ভাত নাই, বৌ-এর চন্দ্রহার।
(খ) মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বোউকে পরাই ঢাকাই শাড়ী।
(গ) মা মরেন দোষ নাই, বৌ বাঁচলে বাঁচি।

লোকসমাজে শাশুড়ী ও বধূর সম্পর্ক প্রায়ই মধুর নয়। কারণ একদা, গৃহিণী-শাশুড়ীর নিকট থেকে নববধূ একে একে সব কেড়ে নেয় —এমনকি নিজের পুত্রটিও নববধূর কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়, তাই গৃহিণী শাশুড়ীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত অষ্টক গানে।

ওরে বউ হইয়াছে রাজরাণী
মা হইয়াছে তার চাকরাণী।
বধূর কথা মধুর লাগে
জয় করে সে সুন্দরী।

বিয়ে করার পর ছেলে, মাকে কোন কোন ক্ষেত্রে অবহেলা করে। তার সমস্ত দৃষ্টি নিবন্ধ হয় নববধূর দিকে। উপেক্ষার ব্যথায় দীর্ণ মায়ের মন সঙ্গীতের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে নিজেকে একটু হাল্কা করতে

চায়। মেদিনীপুর জেলায় বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে দেখি—

যুগের নাহিক বিচার গো এযুগ বড় চমৎকার,
বৌ-এর লেগে মিষ্টি বাটি, তবু বলে আর কি খাবি গো,
মায়ের লাগি মারকুড়া জুটেনা আহার গো
বৌ-এর বেলায় শাড়ী কাঁঠী গলে সোনার হার গো
মায়ের লাগি শিকল গড়ি গলে থেলে থেকে কি বাহার গো।

২. শাশুড়ী ঃ

একদা যে গৃহে শাশুড়ীর প্রাধান্য ছিল সেই প্রাধান্যকে পুত্রবধূ আসার পরও ধরে রাখতে চায় শাশুড়ী। তাই সব সময় সে নিজের দোষ ঢেকে নববধূর দোষ খোঁজার চেষ্টা করে। প্রবাদগুলিতেও তার ছায়া পড়েছে—

(ক) সোনামুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়,
খ্যাঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খায়।

(খ) বউ ভাঙলে সরা গেল পাড়া পাড়া
গিন্নী ভাঙলে নাদা ও কিছু নয় দাদা।

(গ) বৌ-এর চলন ফেরণ কেমন ?
তুর্কী ঘোড়া যেমন।
বৌ-এর গলার স্বর কেমন ?
শালিক চেঁচায় যেমন।

লোকসমাজে শাশুড়ীর গঞ্জনা গৃহের নববধূকে প্রায়ই যন্ত্রণা দেয়। তার সব সুখ স্বাচ্ছন্দ কেড়ে নেয়। কিছুতেই তাকে সুখী হতে দেয় না। মেদিনীপুর জেলার একটি খেমটি গানে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

হায় গো দারুণ বিধি, শাশুড়ী হয়েছে বাদী
ঘরে আছে ননদিনী বিচ্ছেদের পানা
আমার প্রাণে সহ্য হয় না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা
শাশুড়ীর চার ব্যাটা ঘরে প'রে লাগায় ল্যাঠা,
হেন স্বামীর ঘরে কভু আমার সুখতো হোলো না,
দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা ॥

শাশুড়ী শুধু গঞ্জনা দিয়েই ক্ষান্ত নয়, কোন কাজও সে করতে চায় না। তাই এক নববধূ অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে মায়ের কাছে অভিযোগ করেছে—

> যা, মা, তোর জামাইয়ের বাড়ী আমি তো যাব না ;
> তোর জামাইয়ের বাড়ীর ঠেলা দূরের ঘাটে জল আনা।
> শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়ে না।

কৃষিজীবী দরিদ্র সমাজের অভিমান ক্ষুব্ধা এই বালিকা বধূটিকে গৃহ-কর্মে কেউ সাহায্য করে না।

৩. **শাশুড়ী-ননদ :**

শাশুড়ী এবং ননদ সম্পর্কে নববধূর ধারণা চমৎকার ভাবে ধরা পড়েছে বাংলা প্রবাদগুলিতে—

(ক) জাউলী আপনা উলী
ননদ মাগী পর
শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতন্তর।

জা আর ননদ সম্পর্কে ধারণা—

(খ) দেখে শুনে বড ঘরে বিয়ে দিল বাপে,
এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে।

শাশুড়ী সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ—

(গ) শাশুডী ম'ল সকালে
খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে তো কাঁদবো আমি বিকালে।

ননদ সম্পর্কে নববধূর তিক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে নিম্নবর্ণিত প্রবাদে—

(ঘ) ভাল কথা পড়ল মনে আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।

শাশুড়ী এবং ননদ মাঝে মাঝে নববধূর নিকট এক বিভীষিকা বলে মনে হয়। এর আগের লোকসংগীতে দেখেছি শাশুড়ী ননদিনী একজোটে নববধূর সঙ্গে অসহযোগীতা করেছে। তাই নববধূ সবসময় বাবার বাড়ী যাওয়ার জন্য উন্মুখ। আর ভাই তাকে নিতে এসেছিল কিন্তু শ্বশুর-

বাড়ীর অনুমতি মেলেনি তাই ব্যথাহত এক বধূর করুণ সুর একটি জাওয়া গানে ধরা পড়েছে—

শাশুড়ী ননদীর ঘরে না পাঠিয়ে দিল গো
ভাই আমার কাঁদিয়ে ফিরিল গো ॥

স্বামী গৃহে নববধূকে স্বামী যে লাঞ্ছনা করে তার নীরব সাক্ষী কথনও কথনও শাশুড়ী এবং ননদিনী। কিন্তু তারা এই লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে না। বোধহয় এই লাঞ্ছনায় তাদেরও প্রচ্ছন্ন সম্মতি রয়েছে।

আমার শাশুড়ী আছে, ননদী আছে, আছে ভাইগুনা বউ
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল আউ গাইল না কেউ। ১

৪. ননদ :

ননদের সঙ্গে বৌ-এর সম্পর্কে লোকজীবনে অধিকাংশ সময়ে ভাল নয়। একটি টুসু গানে তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

আলগা লটে শালগা লটে খোলা ভর্ত্তি রাণবো
বড়বৌ খুঁজতে গেলে মুমচকে দিব,
বড়দাদা খুঁজতে গেলে বাটি ভর্তি দিব। ২

উক্ত গানটিতে ননদ নটে শাক রান্না করবে—বড়বৌ চাইলে 'মু-মচকে' দেবে—যা নঞর্থক—কিন্তু সে বড়দাদাকে বাটি ভর্ত্তি তরকারি দেবে। এই পক্ষপাতিত্বের কারণটি সহজেই অনুমান করা যায়। আজ সে ননদ —সে বোন। এই বোনের সঙ্গে দাদার সহৃদয় সুসম্পর্কের মাঝে অংশীদার হিসেবে বৌদির আবির্ভাব। দাদার স্নেহ-ভালবাসা বৌদি আসার পরই বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই ননদ বৌদিকে সহ্য করতে পারছে না। শাশুড়ীর ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

৫. সতীন :

সতীন—লোকজীবনে একটি 'বিষ ফোঁড়া'। কোন নারী কোনদিনই তার স্বামীর ভালবাসার অংশ অন্য কাউকে দিতে রাজী নয়। তাই অহরহ দু'সতীনে মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি—অহেতুক কলহ।

এ ব্যাপারে প্রচলিত প্রবাদ হোল—

(ক) দুই সতীনের ঘর খোদায় রক্ষা কর।

(খ) যমকে ভাতার দিতে পারি
সতীনকে তবু দিতে নারি।

(গ) সতীনের পুত—সুন্দর ও ভুত।

(ঘ) সতীনের পো-এর হাত দিয়ে সাপ ধরানো।

উক্ত প্রবাদগুলিতে যে চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে—অনুরূপ চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে লোকসঙ্গীতে। মেদিনীপুর জেলার ধরমপুর (গোয়ালতোড়) অঞ্চলের একটি টুসু গানে দেখা যাচ্ছে—এক 'বধূ' মুড়ি ভেজেছে—এবং 'সিকায়' তুলে রেখেছে—অবশ্যই সতীনকে না দিয়ে, তার উদ্দেশ্য সতীনকে 'পান্তা' ভাত খাওয়াবে এবং ঠাণ্ডায় শুইয়ে রেখে 'সান্নিপাত' নামক অসুখটি ধরাবে। যাতে ঐ মহাব্যাধির কবলে পড়ে স্বামী সুখের অংশীদার সতীনটি মারা যায়—

মুড়ি ভাজলাম সিকায় তুললাম
খালি সতীন পান্তা ভাত,
ঠাণ্ডা শুঁয়ায় রাখে
জুটাব লো সান্নিপাত। ৩

"সান্নিপাত" কালাজ্বর এবং ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগ, প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা এবং পরিণামে সুচিকিৎসা না হলে অবশ্যই মৃত্যু—রোগটি অতীতে বহুল বিস্তারিত ছিল। গানের মধ্যে উক্ত রোগের নাম ব্যবহারই প্রমাণ করে এটি অন্ততঃ পক্ষে একশ' বছর আগেকার গান।

অন্যত্র একটি 'জাওয়া' গানে দেখা যাচ্ছে একটি নারী তার স্বামীর মৃত্যু ব্যথা সহ্য করতে পারবে কিন্তু সতীনের জ্বালা সহ্য করতে পারবে না।

সিঁথিকি সিঁদুর ছুটলে পারবু সহিতে
ওগো তাও না সহিব আমি সতীনের ঝাল। ৪

৬. ভাসুর ও ভাদ্র-বৌ :

লোকজীবনে ভাসুর 'পদ'টি সম্মানজনক। তবুও কোথাও কোথাও সন্দেহের ছায়া উঁকি মারে। পবিত্রতা-ভদ্রতাবোধ লাঞ্ছিত হয়। আশংকা থাকে শান্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার।

ভোর রাতে অন্ধকার থাকতে থাকতে এক ভাদ্র-বৌ ঘরে ঢুকে চৌকা দিতে গিয়ে এক বিপদে পড়েছে—সেখানে রয়েছেন ভাসুর। এ ঘটনা যদি দিদি দেখেন তবে লংকা কাণ্ড বেঁধে যাবে। তাই ভাসুরের কাছে করুণ মিনতি জানায় ভাদ্র বৌ। নিচের টুসু গানটিতে দেখা যাচ্ছে—

আঁধার রাতে ছাঁচ গুলেছি (চৌকা দেওয়া)
ভাসুর বলে জানি নি,
ও ভাসুর তোর পায়ে পড়ি
দিদি যেন না জানে। ৫

৭. শ্বশুর বাড়ী—যমের বাড়ী ঃ

নব বিবাহিতা বালিকা বধূ তার শ্বশুর বাড়ী যেতে চায় না। প্রথমতঃ পরিচিত সকলকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি স্থানে যাওয়া যথার্থই কষ্ট কর। দ্বিতীয়তঃ নতুন পরিবেশে তাকে নানারকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়—পণ দেওয়া নেওয়া, যৌতুকের মূল্যমান নীচু হওয়া, অহেতুক উপেক্ষা, স্বামীর অনাদর, শাশুড়ির গঞ্জনা—ননদের শত্রুতা ইত্যাদি কারণে কন্যাটির পক্ষে কষ্ট হয় দীর্ঘ দিন নতুন পরিবেশে বন্দী হয়ে থাকতে। বাংলা লোকসঙ্গীতে এই সমস্ত চিন্তা-চেতনা ধরা পড়েছে অনবদ্যভাবে। স্বামীর বাড়ী যেতে অনিচ্ছুক এক কন্যা—তার প্রকাশ নিচের লোক সঙ্গীতে—

যা মা, তোর জামায়ের বাড়ী আমি তো যাব না।
তোর জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে
বছর অন্তর একদিন ফিরে
সারা রাত্রি কাগজ মারে, ডাকলে কথা বলে না। ৬

উক্ত লোকসঙ্গীতে স্বামীর অনাদরের জন্যই কন্যাটি শ্বশুর বাড়ী যেতে চায় না।

স্বামীর বাড়ীতে অসম্ভব দারিদ্র। একদিন হলুদ বাটলে তিন দিন ধরে তাই রান্নায় ব্যবহার করতে হয়। এই দারিদ্র অসহনীয়—মা বাবাকে কন্যাটি ব্যঙ্গ করেছে বাঁকুড়া জেলার একটি করম গানে—

এক দিনকার হলুদ বাটা তিন দিনকার বাসি,
মা বাপকে বলে দিবি বড়ই সুখে আছি।

ছোটবেলার সঙ্গী আদরের ভাইটিকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে থাকতে বড্ড কষ্ট দিদির। একটি করম গানে দিদি নিবিড় অনুরোধ করেছে তার আদরের ভাইকে।

সব পরবেই আসবি ভাই, করম পূজায় আসবিরে
করম ফুল আনবার সময় সাথী মনে পড়েরে।

শ্বশুর বাড়ীতে প্রচণ্ড কাজের চাপ। গোঁসাই ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহিতা এক নারীর কণ্ঠে অভিযোগ—গোঁসাই ঠাকুর শিষ্য বাড়ী ঘুরে বেড়ান মাঠে মাঠে। অন্য কোন কাজ তাকে করতে হয় না তাই গায়ের রঙ তার ভালই আছে—কিন্তু নারীটি কাজ করে করে কালো হয়ে গেছে—উক্ত ঘটনার ক্ষুব্ধ সঙ্গীত—

মাঠে মাঠে গোঁসাই ঠাকুর আছে বরণ ভালো
শ্বশুর বাড়ী হাঁড়ি মাইজ্যে গা হইল কাল।

উক্ত লোকসঙ্গীতটি মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া গেছে।

নারীর সহনশীলতা অনেক বেশী। কিন্তু প্রতিটি কাজের একটি সীমা আছে। স্বামীর বাড়ীর লাঞ্ছনা—মারধোর বধূকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। সেখানে তার সমব্যথী কেউ নেই—শ্বশুর-ভাসুর-শাশুড়ী-ননদী এমনকি ভাগ্না-বউ পর্যন্ত তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে না। এরকম ঘর তো যমেরই ঘর!

আমার শ্বশুর করে খুসুর খুসুর ভাসুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্যা ধরল চুলের খোঁপা।
আমার শাশুড়ী আছে, ননদী আছে, আছে ভাইগ্না বউ
(হা-রে) এমন কইর্যা মাইর মারিল আউ-গাইল না কেউ।

কন্যা এই যমের বাড়ী আসতে চায় না—তাকে জোর করে এখানে পাঠানো হয়েছে—একটি টুসু গানে দেখি—

এত বড় পোষ পরবে
সবাই পরে নীল শাড়ী,
আমার বাবা হতভাগা
পাঠাল শ্বশুর বাড়ী। ৭

শ্বশুর বাড়ীতে নারীর কোন স্বাধীনতা নেই। পরবে ইচ্ছা মত শাড়ীও পরা যাবে না। সব জেনেও কন্যাটিকে তার বাবা জোর করে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা বিদ্রোহিনী হয়ে উঠেছে। পিতৃকুলের পরিচয়ের জন্য সে অহংকারও প্রকাশ করেছে লোকসঙ্গীতের মধ্যে—

ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই ভাত আন্ধিবার
মুই তো মোড়লের বিটি,
ভাত আন্ধিবার না জানি,
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী। ৮

স্বামীর গৃহবাসী কন্যা আকুল হয়ে আছে পিতা-মাতার কুশল জানার জন্য। কিন্তু কে এনে দেবে খবর? হঠাৎ ঘরের চালে বসে থাকা কাককে দেখে কন্যার মনে হলো কাক তো সর্বত্রগামী। ছেলেবেলায় বাবার বাড়ীর সামনে কত কাক দেখেছে সে। এই কাক কি আজ তার বাবার বাড়ীর খবর এনেছে। বাঁকুড়া জেলার কাঁঠালিয়া অঞ্চলে একটি করম গানে দেখা যাচ্ছে—

কা কা করলি কাউয়া, বসলি ঘরের চালে রে
সত্যি করে বলবি কাউয়া মা কেমন আছে রে।
কা কা করলি কাউয়া বসলি ঘরের চালে রে—
সত্যি করে বলবি কাউয়া বাবা কেমন আছে রে।

৮. বধূঃ

যে ছিল একদা কন্যা, আদরের দুলালী স্বামী গৃহে তার উপর চলে অকথ্য অত্যাচার—উপেক্ষা—অপমান। এত কিছুর মধ্যেও সে চায় স্বামী সঙ্গ। দুঃখ ভুলতে চায় সে তার অতীত জীবনের পরিজনকে ছেড়ে আসার। পুরুলিয়ার করম সঙ্গীতে একটি নারী কণ্ঠের কামনা প্রকাশিত—

তুমি যাবে পরদেশ আমি যাব সঙ্গে
রাঁধিব বেগুন ভাত পরশিব রঙ্গে।

উক্ত গানটির মধ্যে তিনটি কামনার কথা প্রকাশিত, এক—স্বামী সঙ্গে থাকার, নারীর চিরন্তন কামনা। দুই—সাধারণভাবে জীবন যাপনের

চিত্র বেগুন ভাতে দিয়ে রান্না তাতেও দুঃখ নেই। তিন—বঙ্গদেশে প্রবেশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। স্বামী সেবাই ভারতীয় নারীর চিরন্তন সাধনা। সীতা-সাবিত্রীর দেশ ভারতবর্ষ। লোকসঙ্গীতের মধ্যে নারীর পতি সেবার কথা ধ্বনিত হয়েছে।

স্বামী নিন্দা করে যারা, মহাপাপের পাপী তারা
স্বামী সেবা করে যারা, তারাই তো নবীন গো।

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে স্বামীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীকে ভগবান বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনাগুলিও চমৎকার—দুধ, গুড়, কিংবা পরপুরুষ—লোক জীবনে এগুলির আকর্ষণ নিতান্ত অবহেলার বিষয় নয়। কিন্তু এগুলির স্থায়ীত্ব—সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। এগুলিতে সাময়িক আকর্ষণ থাকলেও চিরন্তনী নয় এগুলি—এ সবের উর্দ্ধে স্বামীকে স্থান দিয়েছে ভারতীয় নারী।

দুধও মিছা, গুঁড়ও মিছা পরের পুরুষ মিছা
আপনার পুরুষ মহা ভগবান, ঐ দিকে ভয়ঙ্কর জুয়ান। ৯

৯. **নারী ঃ**

নারী চিরদিনই রহস্যময়ী। আলো-আঁধারে ঢাকা তার মন। সে মনের নাগাল দেবতারাও নাকি সব সময়ে পান না। মানুষের কাছে—সে তো মায়াময়ী হবেই। বাংলা লোকসঙ্গীতেও নারী তেমনি রহস্যময়ী—

রমণীর মন আছে—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না
পদে পদে দেয় যাতনা কঠিন হৃদয়।
নারী জাতি অবিশ্বাসী, অন্তরে বিষ, মুখে হাসি
গলে দিয়ে প্রেম ফাঁসি ফিরিয়ে না চায়।

সব নারীই সমান নয়। বিভিন্নতা অবশ্যই আছে তাই সে মানবী। তা না হলে তো তাকে বলা যেত যন্ত্রমানবী। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি আলকাপ গানে অবৈধ প্রেমে মত্ত এক নারী স্বজন ও কুলের মৃত্যু কামনা করেছে। 'কেলে সোনা' নামটির মধ্যে কৃষ্ণের ছায়া আছে তবু এটি একটি গুপ্ত প্রেমিকের ছবি।

শ্বশুর মরুক, ভাসুর মরুক, মরুক ছোট দেওরা,
শাশুড়ী ননদী মরুক রে
বাঁচুক কেলে সোনা রে ॥

যদি এটি গুপ্ত প্রণয়ের ছবি না হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে শ্বশুর—ভাসুর—ছোট দেবর—শাশুড়ী—ননদী চরিত্রগুলি অত্যাচারী, হয়ত সে কারণেই তাদের মৃত্যু কামনা করে, আপন কালো স্বামীর দীর্ঘ জীবন কামনা করা হচ্ছে।

প্রেমদান করে অমৃত। কিন্তু বিরহ আনে দহন। নারী জীবনের চিরন্তন কামনা নদীয়া জেলার একটি আলকাপ গানে ধরা পড়েছে—

ওরে আমার প্রাণ বন্ধুয়া ঘরে নাই,
প্রাণ বন্ধুয়া ঘরে নাই, হায়রে সোনার যৌবন
বিফলে চলিয়া যায়
বন্ধু আমার জীবনের জঞ্জাল,
আঁচল দিয়ে যত্ন করে
রত্ন ধন ঢেকে রাখবো কত কাল।

১০. **নারী স্বাধীনতা ও লোকমানস ঃ**

লোক সঙ্গীতগুলি প্রায়শঃই গ্রাম-জীবনে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান পুরুষ-শাসিত সমাজে গ্রাম্য নারীরা গৃহবন্দী। গৃহের বাইরের স্বাধীনতা তার নেই বললেই চলে। কিন্তু নগর-জীবনের নারীর যে অগ্রণী ভূমিকা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে তা নগর-জীবন অতিক্রম করে গ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। গ্রামের মানুষের চোখে তা বিসদৃশ বলে মনে হয়েছে।

যুগ স্বাধীন এবার
মেয়েরা সব করেছে স্যাণ্ডেল ব্যবহার।
কলির মেয়ে স্বাধীন হোল গো
সতীত্ব আর রাখল না
নিজ পতি ত্যাজ্য করি উপপতি ছাড়ল না।

নারীর এই বিকৃত বিদেশী, অনুকৃত স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। লোকসমাজ লোকসঙ্গীতের মধ্যে তাকেই ব্যঙ্গ করেছে—বলা

যেতে পারে ধিক্কার জানিয়েছে। আধুনিক নগর-জীবন গ্রামীণ সংস্কৃতিকে হটিয়ে দিচ্ছে। লোক কবিতা সহ্য করতে পারছে না—যদিও এই সঙ্গীতের মধ্যে নিরপেক্ষতা নেই তবু গ্রামীণ মানসিকতাকে যে নগর জীবন আন্দোলিত করেছে—এবং নগর জীবনও সভ্যতাকে লোকজীবন যে সহজে মনে গ্রহণ করতে পারেনি তারই প্রমাণ নিচের গানটি—

কলি কালের বৌ বিটি, সকাল হলে পরিপাটী
আরশিটি দেখে তারা জলে মুখ দেয়।

*　　　　*　　　　*

(* ছো—ছড়া সকল ভুলি, সকাল হলে
ধরে চায়ের কেটলি
এ সব দেখে বুক ফেটে যায়।
(* ছো—ছড়া—চৌকা দেওয়া)

১১. **লোকসমাজে ধনী :**

"তেলা মাথায় তেল দেওয়া" এই প্রবাদটি চিরন্তনত্ব অস্বীকার করা যায় না। যার অর্থ আছে—সম্পদ আছে তাকে সকলেই সমীহ করে—সর্বকালেরই এমনটি ঘটে। লোক জীবনেও ধনী আত্মীয়ের সমাদর সব সময়ই আছে। তার আপ্যায়ন একটু বেশী-ই হয়। কিন্তু আত্মীয় যদি দরিদ্র হয় তবে সে পায় উপেক্ষা—

ধনী কুটুম এলে বঁধু
জল খাবার দিই চিড়া গুড়—স্বর্ণ কাঞ্চন থালে বন্ধু।

ধনীর জন্য 'স্বর্ণ কাঞ্চন' থালা দরিদ্র লোকসমাজ হয়ত সত্যিই দিতে পারে না কিন্তু দেওয়ার মানসিকতা তো আছে—তার উপর লোকজীবনে চিঁড়ে-গুড়—একটি সম্মানজনক খাদ্য। ধনী আত্মীয়কে তা-ই পরিবেশন করে—তাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করা হয়।

১২. **লোকসমাজে-দরিদ্র :**

'পয়সা নাই যার মরণ ভালো এ সংসারেতে'—এই লোকসঙ্গীতই যেন চিরসত্য কথাটিকে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছে—সুরের মাধ্যমে।

অর্থহীন মানুষের সম্মান নেই—সমাজে কোন প্রতিপত্তিও নেই। দারিদ্র দোষ আবার সমস্ত গুণ রাশিকেও নাশ করে। দরিদ্রের বিপদে তাকে কেউ সাহায্যও করতে এগিয়ে আসে না।

কলি যুগের এমনি ধারা গরীব জীয়ন্তমরা বন্ধু
বিনা জায় পথ চলে চায় না কেউ মুখ তুলে বন্ধু।
(জায়—পথ খরচ)

দরিদ্র্যেরও মনে সাধ আছে একটু স্বাচ্ছন্দে সে থাকবে। এই সাধকে লোকমানস সহজ মনে গ্রহণ করে না। তার কারণ বোধ হয় বিলাসিতা দরিদ্রের জীবনে চরমতম অভিশাপ ডেকে আনতে পারে। তাই সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যঙ্গের চাবুক কশানো হয়।

ঘরে নাই যার ছিঁড়া কাঁথা
হাট গেলে তার পায়ে জুতা।
হাতে নাই যার পয়সা কড়ি
আগে শুধায় পানের দর॥

১৩. **অর্থ-অনর্থ :**

কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। অর্থের জন্য—সম্পদের জন্য পিতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরে। মানসিকতা বোধ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতেও মানুষের কুণ্ঠা হয় না। নিচের লোকসঙ্গীতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

জমি জায়গার ভাগ না দিলে
বাপ বেটাতে মামলা চলে
মিছা কথা সাক্ষী কইরে
দু'টি টাকা ঘুস পাইলে
কলি তোর আসলে কত রঙ্গ দেখালে কলিকালে।

১৪. **সামাজিক অসাম্য :**

লোকসমাজে ধনী দরিদ্রের শ্রেণী বিন্যাস অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা। ধনীর লোভ এবং দরিদ্রের হতাশা—সমাজের মধ্যে এই

অসাম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তাই শুরু হয়ে গেছে শ্রেণী সংগ্রাম। সাধারণ মানুষ সমাজের এই অসাম্যের কথা প্রকাশ করেছে একটি গম্ভীরা গানে। গানটিতে লোকদেবতা শিবের কাছে এই সামাজিক অসাম্যের কথা নিবেদন করা হয়েছে।

শিবহে, সিদ্ধিতে বেশ দম দিয়ে গাঁজা টেনে
আজ আছ ভালই সুখে
এদিকে কারও লেংটি, আবার কেউ মটর গাড়ী হাঁকে।
দুঃখ হয় তাই, জানাই তোমার
লীলা দেখে।

লোক-সমাজে শুরু হয়েছে ভয়াবহ অবক্ষয়। লোক-জীবনে প্রবেশ করেছে—অন্যায়, জালিয়াতি। 'ব্ল্যাক মার্কেট'ও লোকজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। একদল মানুষ সুখে আছে—আধুনিক নাগরিক স্বাচ্ছন্দ সে ভোগ করে যাচ্ছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম সেবা, মানবিকতা সব যেন রসাতলে গেছে। একটি গম্ভীরা গানে লোক দেবতা শিবের নিকট সাধারণ মানুষের নিবেদন –

আজকাল ভাল মানুষির দিন গিয়াছে
ওহে পশুপতি,
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা মোদের দুর্গতি।
জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুড়্যা
ব্লাক মার্কেট বাজার ভইর্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায় জ্বালায় বিজলী বাতি।
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা রসা তলে গেল ডুব্যা
হিংস্যা বিবাদ দলাদলি হায়রে কি দুর্মতি।

১৫. সমাজ জীবনে বেকারত্ব ঃ

লোকসমাজ বর্তমানে উন্নত হয়েছে। সেখানে শিক্ষা প্রবেশ করেছে। কিন্তু শিক্ষা সব সময়ে চাকরির সন্ধান দিতে পারছে না। ফলে চতুর্দিকে বেড়েছে শিক্ষিত বেকার। অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে বেকার মানুষ জীবন যাপন করছে। বেকারত্বের যন্ত্রণায় সমাজজীবন ধুঁকছে, তার ছবি ধরা পড়েছে নিচের গম্ভীরা গানে—

বি. এ., এম. এ, পাশ করে কত বঙ্গ সন্তান
চাকুরী খুঁজে খুঁজে হয়ে গেল হয়রান
করিতে পারে না তারা নিজের পেটের সংস্থান
হল হতাশে সদাই ম্রিয়মান।

১৬. লোকজীবনে প্রেম :

প্রেম সব যুগে সব কালে একই রকম। এর কোন পরিবর্তন নেই। নিবিড়ভাবে ভালবাসার নাম প্রেম। নিজেকে অপরের চোখে আবিষ্কারের নাম প্রেম। প্রেমত্যাগ করতে শেখায়—প্রেম-পরশমণি। প্রেম নূতনভাবে বাঁচার মন্ত্র শেখায়। লোকসঙ্গীতে যত বাণী—যত সুর—তার তিন ভাগই প্রেম নিয়ে রচিত। মনে হয় প্রেমের আবেগই সঙ্গীত রচনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রেমের ভাষা চোখাচোখিতেই শুরু। আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ স্তর ভেদে ভিন্ন মূর্তি।

প্রথম সঞ্চারে প্রেম মধুময়। কিন্তু যতদিন যায় গৃহজীবনে কর্মের চাপে প্রেম মলিন হয়ে যায়। ফলে অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থনে তার যন্ত্রণা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে। বাঁকুড়া জেলার কাঠালিয়া অঞ্চলের একটি খেমটি গানে দেখা যায়—

প্রথম পিরীতি কালে স্বর্গের চন্দ্র হাতে দিলে,
বল বল বধূ, সে দিন কি বলেছিলে,
আজ প্রাণে দাগা দিলে।

ভালবাসার জন্য জাতি ত্যাগ করা যায়। কিন্তু প্রেম ত্যাগ করা যায় না। লোক-জীবনের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির কামনা, যদি যৌবনকে চিরস্থায়ী করে রাখা যেত তাহলে বোধ হয় প্রেমও চিরস্থায়ী হোত।

বারেক জাতি ছাড়া যায়, পিরীতি ছাড়া দায়
এখন পিরীতি ল্যাঠা লাগিল হিয়ায়।
এমন যৌবন যদি চিরদিন থাকিত
কি সুখ হইত সখী, কি সুখ হইত।

প্রেম যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি প্রেম আবার কাঁদায়। লোক গানে প্রেম পরশমণি-চিরন্তনী-সব্যসাচী। রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে লোক-জীবনের

লৌকিক পার্থিব প্রেমই ধরা পড়েছে নদীয়া জেলার একটি আলকাপ গানে—

শ্যাম দে দে তোহার মোহন বাঁশী
তোর বাঁশী, তোর হাঁসি আমি বড় ভালবাসি
তুমি বাজাচ্ছ রাধা বলে, আমি বাজাব শ্যাম
তুমি কাঁদ কি আমি কাঁদি এমনি মোদের প্রেম
তোর রূপে তোর গুণে আমি হব চিরদাসী।

লোক-জীবনে প্রেম বিচিত্রমুখী। প্রথম দর্শন জাত প্রেম ধরা পড়েছে নদীয়া জেলার একটি আলকাপ গানে। গানটিতে প্রেমিকের কামনা—সে সুতো হবে—নতুবা সোনা হবে—তাহলে সে প্রেমিকার কাছাকাছি থাকতে পারবে।

কোথায় হতে এলে বন্ধু কোথায় ঘর বাড়ী,
এইবার মরে সুতো হবো, তাঁতি দাদার ঘরে যাব
ভাল ভাল গামছা হবো, আরও হবো ঢাকাই শাড়ী
এইবার মরে সোনা হবো স্বর্ণকারের বাড়ী যাব
ভাল ভাল পাশা হবো থাকবো নারীর কানেতে
মন বাঁধা রয়েছে আমার এলোকেশীর গামছাতে।

বিদেশীকে লোক সমাজ সহসা সহজ মনে গ্রহণ করে না। হলুদের রঙের ঔজ্জ্বল্য ঠিক কিন্তু তা ধুয়ে দিলে উঠে যায়। তেমনি বিদেশীর সঙ্গ নিবিড়তা আনে উন্মত্তা আনে কিন্তু বিদেশী সহসা সরে পড়ে তখন করার কিছুই থাকে না। মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের একটি লোক সঙ্গীতে একটি অসাধারণ। উপমাময় লোকজ্ঞান লক্ষ্য করা যায়—

যেমনি হলুদ রং গো তেমনি বিদেশীর সঙ্গ গো
ও ভাব করবে সাবধানে ও বিদেশী সনে।

প্রেম সবসময় সোজা পথে চলে না। মাঝে মাঝে লোক-সমাজের রীতি নীতি ভেঙে সে ভিন পথে চলে যেতে চায়। গুপ্ত প্রণয় লোক-জীবনে মাদকতা আনে। ভালবাসা ভূগোল মানে না—তা শাশ্বত। একটি ঝুমুর গানে গুপ্ত প্রণয়ে ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে—

যার সঙ্গে যার ভালবাসা মরিলেও না ছুটে
যার সঙ্গে যার গোপন পিরীত সেই তো মজালুটে।

ভালবাসা বিচিত্রমুখী। বাঁকুড়া জেলার একটি খেমটি গানে দেখা যাচ্ছে—একটি নারী তার স্বামীকে না ভালবেসে ভালবাসে তার ছোট দেওরকে। এমনকি নারীটি তার স্বামীর মৃত্যু কামনাও পর্যন্ত করেছে—

ছোট দেওর তোর আঠলা কথা সই নারে
ছোট দেওর তোর আঠলা কথা,
স্বামী গেছে ধান কাটিতে বাঘে ধরে থাক
ছোট দেওর বেঁচে থাক।

পরকীয়া প্রেমের ভয় পদে পদে। লোক সমাজে নানান দৃষ্টি এড়িয়ে চলে এই প্রণয় লীলা। নদী যত বাধা পায় ততই তো উচ্ছ্বসিত হতে চায়—তবু প্রেম ভীরু পদে, দুরু দুরু বক্ষে হেঁটে বেড়ায় লোক সঙ্গীতে। বাঁকুড়া জেলার খেমটি গানটিতে—"তাম্বুল" প্রদানের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই 'তাম্বুল' কিন্তু লোকজীবনে প্রেম পর্বের প্রথম দৃশ্য।

হাতে হাতে পান দিতে দেখেছে পাড়ার লোকে,
চুন দিতে দেখেছে ভাসুরে,
সখীরে, আজ আমাদের কি আছে কপালে।

পরকীয়া প্রেম এক গৃহবধূকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে ঝুমুর খেলার প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কিন্তু বাধা হয়েছে শ্বশুরের শুয়ে থাকা—ভাসুরের উপস্থিতি—আর প্রভু ভক্ত একটি কুকুরের উপস্থিতি—

ই-দুয়ারে শ্বশুর শুয়ে, উ-দুয়ারে ভাসুর শুয়ে
মধ্যে কুকুর ভুঁকেরে
পায়েতে পঁইরি বাজে ঝুমঝুম কেইমে বাহির হবরে।
(পঁইরি—নূপুর)

গুপ্ত প্রণয়ে অভিসারে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভাসুর শ্বশুর এবং কুকুরের সঙ্গে পায় বাঁধা নূপুরও বাধার সৃষ্টি করেছে। মেদিনীপুর জেলার বাঁশ-পাহাড়ী অঞ্চলে একটি করম গানে পরকীয়া প্রেমের একই রকম বাধার ছবিটি ফুটে উঠেছে—

ঘরেতে শ্বশুর ভাসুর দুয়ারে কুটুম
কি করে বাহিরাব শ্যাম দু'পায়ে নেপুর।

লোকসমাজে প্রেম যেমন অমৃত দান করে—আবার বিচ্ছেদের আগুনও জ্বালে। কেউ কেউ সেই আগুনে আত্মাহুতি দেয়—কেউ কেউ প্রতি-হিংসা পরায়ন হয়ে প্রাণ কেড়ে নিতে চায়—নদীয়া জেলার একটি খেমটি গানে দেখা যাচ্ছে—

জ্বালায়ে আগুন পালায়ে গেলি
পরে নিভায়ে গেলি না রে কালা।
নদীর ধারে বাঁধে বাড়ি, কোমর লয়ে আড়াআড়ি
বাঘের সঙ্গে বাঘ চাতুরি বৈদ্যের সঙ্গে বিবাদ করা ॥
তোমার প্রাণ কেড়ে নিব, আপন মনকে বুঝায়ে নিব
না হয় দু'দিন কষ্ট পাব, প্রাণে মরব না রে কালা ॥

১৭. লোকসমাজে পণপ্রথা ঃ

পণপ্রথা এক সামাজিক অভিশাপ। টাকা নিয়ে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রথা বহুদিন পূর্বে আমাদের লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এটি ছিল ছেলের কাছে পণ নেওয়ার প্রথা। জলপাইগুড়ি জেলার একটি গম্ভীরা গানে দেখা যায় কন্যা, তার মা বাবাকে গালাগালি দিচ্ছে—এমন কি মৃত্যু কামনাও করেছে। কারণ তারা তাদের কন্যাকে এক নাবালক বরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়া পাথারে।
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক নাবালক ভাতারে ॥
বাপ মরুক মাও মরুক রে মরুক পাড়ার লোক।
কারেয়া মরাক বাঘে খাউক নিধুয়া পাথারে ॥
বাপ মাওক জানাও খবর রে কিনিয়া পেঠাউক গাই।
তাহার দুগ্ধ খায়া মানুষ হউক নাবালক জামাই ॥

পণপ্রথার কুটিল আবর্ত্তে আর অভিশাপে সমাজ জর্জরিত। লোক-সমাজে তাই ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। তাদের হাতে প্রতিবাদের অস্ত্র নাই—কিন্তু সমাজের নায়ক যারা, তারা চুপ করে আছে কেন? লোক সমাজের বিশ্বাস পণপ্রথার দুর্বিসহ যন্ত্রণার জন্য যুগের কোন দোষ

নেই, সব দোষ সমাজ ব্যবস্থার—পুরুলিয়া জেলার একটি টুসু গানে দেখতে পাচ্ছি—

বেটি বিকা হোল দায় বরকে গাড়ী সাইকেল চায়।
পণের চলন ছিল আগে কুলীন বামুন মধ্যে ভাই॥
এখন কিন্তু মনের চলন জাতি ভেদে চলছে নাই।
যতই ধনে হোক না মেয়ে বরকে কিছু কবুল চাই॥
পাত্র এসে পাত্রী দেখবে ফলে ওল্টা ফল সবাই।
বর্তমানে শিক্ষা ধারায় এ প্রগতি চলছে ভাই॥
আই. এ. কিংবা বি. এ. বরে অগ্রিম মোটর সাইকেল চাই।
সমাজ নামছে অধিঃপাতে নায়কদেরও দৃষ্টি নাই,
যুগের কোন নাইরে দোষ, দোষী সমাজ ব্যবস্থাই॥

১৮. নারীর কামনা ঃ

শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্রের সঙ্গে প্রসাধন সামগ্রী এবং অলংকারের প্রতি নারীর কামনা চিরন্তন। নারী সে যে শ্রেণীরই হোক না কেন এই বস্তুগুলির প্রতি লোভ স্বাভাবিক ভাবে লক্ষ্য করা যায়—

আনার কলি শাড়ী লিব, বেনারসী বেলাউজ লিব
লাল রঙের শায়া লিব, বরণ খুলে রইব না
নতুন উঠেছে গয়না।
আয়না লিব চিরুন লিব, নারিকেলের তেল লিব
বরণ খুলে রইব না।

প্রসাধন সচেতনতা লোকনারীর মধ্যে প্রবল, গোয়ালতোড় এলাকার একটি টুসু গানে দেখি—

তোদের ড্যামরা চোখে কাজল কই
তোদের প্যাকলা পায়ে আলতা কই
তোদের সঙ্গে যাব না সই।

সই এর সঙ্গে না যাওয়ার কারণটি লক্ষণীয় যেহেতু তারা 'ড্যেমরা' চোখে কাজল দেয়নি এবং তাদের প্যাকলা পায়ে আলতার প্রসাধন নেই তাই তাদের সঙ্গও পরিত্যাজ্য। ঐ একই স্থানে প্রাপ্ত একটি টুসু গানে দেখি—

ওলো ওলো বৌ দিদি
চুল রাখবি গো যতনে,
ফিতা দিয়ে বাঁধবি মাথা
আমার দাদার দলনে।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রসাধনের লোভে নারী কুল ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।

আয়না লিব, চিরুনী লিব
নারকোলের তিলকা লিব,
পিং দিয়ে মাথা বাঁধব—
কারো বারণ শুনব না।
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না।*

প্রসাধন প্রমত্ত মানুষকে সাবধান করা হয়েছে বাঁকুড়া জেলার একটি খেমটি গানে—উক্ত লোকসঙ্গীতের বক্তব্য—আয় বুঝে ব্যয় না করলে পরিণামে বিপদ আছে—

হাতে রুমাল মুখে পাউডার করে ঝলমল
এমনটা তোর ক'দিন যাবে বল।
না বুঝে তুই গেলি রসাতল,
এমনটা তোর ক'দিন যাবে বল।

১৯. পুরুষশাসিত লোকসমাজে নারীর জিজ্ঞাসা :

পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মনের খবর কেউ রাখতে চায় না। স্বেচ্ছাচারী পুরুষ মনের খেয়ালে নারীকে বধূ রূপে গ্রহণ করে আবার মনের খেয়ালে তাকে ত্যাগ করে। এই ভাবে পরিত্যক্ত এক নারী বরের কাকার মাধ্যমে বরের কাছে তাকে পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে। লক্ষ্যণীয় বরের কাকার প্রতি যে উপমাটুকু সে ব্যবহার করেছে তাতে বোঝা যায় বরের কাকাও গৃহজীবনে তার প্রতি ভাল ব্যবহার দেখায়নি। তাই তাকে বলেছে "শাল বনের শুঁয়া পোকা"।

লোকে বলে ছিঃ ছিঃ আমি করেছি কি,
হাতে শাঁখা নাকে নোলক পরেছি।
বিয়ালা পুরুষে ছাড়েছি, বিয়ালা পুরুষ ছাড়া দিয়ে
শাঙলাই মজেছি।

শাল বনের শুঁয়া পোকা তুই-ই কি হে ছেলের কাকা,
পথের মাঝে দেখা পেলে বলে দেবে প্রিয়াকে
কি দোষে ছাড়েছে আমাকে।
নিজের কুড়াই নিজেই মোবে নিয়েছে
কি দোষে ছেড়েছে আমাকে।

উক্ত উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও মূল বক্তব্যটি বোঝাতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রয়োজন ছিল। লোকসঙ্গীতটি বাঁকুড়া জেলার কাঁঠালিয়া অঞ্চলে প্রচলিত 'বলে দেবে প্রিয়াকে' কথাটি অশিক্ষা জনিত ত্রুটি। লৌকিক সমাজে এরকম ত্রুটি থাকতেই পারে। অবশ্য শুদ্ধ ভাবে শব্দটি 'প্রিয়া' না হয়ে হওয়া উচিত ছিল প্রিয়।

বাংলা লোকসঙ্গীতগুলির মধ্যে লোকসমাজের বিচিত্রতর ছবি ফুটে উঠেছে। অশিক্ষিত লোককবিও শিক্ষিত কবি-র থেকে কোন অংশে কম নন। বর্ণনায় চিত্রকল্পে লোককবি যে কোন নবীন সাহিত্যিকের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৮২।

২। নিজস্ব সংগ্রহ—মহাতাপ নগর, মেদিনীপুর।

৩। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—ধরমপুর, মেদিনীপুর।

৪। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—২য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৩৫।

৫। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।

৬। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১২৫।

৭। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।

৮। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৮২।

৯। ঐ, পৃঃ ৩১৯।

পঞ্চম অধ্যায়

লোকসঙ্গীতে জীবজন্তু পাখী পতঙ্গ

বাঙালীর হৃদয় মাধুর্য তাকে করে তুলে অতিথি বৎসল সৌন্দর্য প্রেমিক। বাঙলার ভূমি বিন্যাস, জলবায়ু এবং বাঙালীর হৃদয় বাঙলার বহুতর বিচিত্র জীবজন্তু, পাখী-পতঙ্গকে ঠাঁই দিয়েছে এখানে। বাঙালী যেমন ফুল ভালবাসে—আদিম কাল থেকে অগাধ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে বিচিত্র বর্ণের ফুলের দিকে তেমনি মুগ্ধ হয়ে দেখেছে প্রজাপতির ডানার বৈচিত্র্য—ভ্রমরের গুঞ্জন, ময়ূরের নৃত্য। মুগ্ধ হয়েছে কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে—ময়নার কথা বলার কৌশলে। বাঙলাদেশে কত বিচিত্র বর্ণের পাখী—বিচিত্র পতঙ্গশ্রেণী আর ভয়াবহ জীবজন্তু থেকে শান্ত জীবজন্তু সবই আছে। আদিমকাল থেকে এদের সঙ্গে বাস করেছে বাঙালী। হিংস্র প্রাণীকে পোষ মানানোর চেষ্টা করেছে সে, আদিম যুগ থেকে। বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করেছে—কেউ কেউ সাপকে গৃহবন্দী করে রেখেছে। এই সমস্ত প্রাণীগুলির কোনটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবেসেছে বাঙালী। কোনটির দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক লাভের আশায় তাকে গৃহপালিত করেছে। কোনটির দ্বারা ভীত হয়ে দূর থেকে তাকে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জানিয়েছে —বর্তমান অধ্যায়ে সেই সমস্ত জীবজন্তু পাখী পতঙ্গের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগের স্বরূপটুকু খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। বাঙালীর লোককথায় শেয়াল—বাঘ, কুমীর, গরুর প্রসঙ্গ বহুবার এসেছে। প্রবাদে পাখী, দেবতা, ফুল, মাছ, শাক-সবজি, পতঙ্গ সবই ঠাঁই করে নিয়েছে। এ সমস্ত দিক থেকে ধাঁধাগুলিও কম যায় না। এ সমস্ত বিষয়গুলিতে বাঙালীর সৌন্দর্য চেতনা—বিস্ময়বোধ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে লোকসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে আমরা দেখব লোকসঙ্গীতে জীবজন্তু, পাখী-পতঙ্গের প্রভাব কতখানি পড়েছে। পাখী নানাভাবে লোকসাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। বাংলা রূপকথায়

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর যেন একচেটিয়া প্রাধান্য। লোককথায় শুক-সারীর ভূমিকা ও কম নয়। লোককথায় পাখীর ডিম থেকে নায়িকার জন্ম হওয়ার কাহিনীও আমাদের চমকে দেয়১ এমনও দেখা গেছে কোথায় কোন রূপসী নারী আছে—তার সংবাদ পুরুষকে দিয়েছে পাখী—লোককথার মধ্যে এ সব তথ্য পাওয়া যায়।

ছড়ার মধ্যেও নানান পাখী শিশুর মনের কোণে ঘর বাঁধার চেষ্টা করছে—কখনও সে লেজ ঝোলা, কখনও নীলকণ্ঠী, কখনও হলুদ রঙা বিশেষণে চিহ্নিত। ছড়ায় পাখী শিশুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়—কখনও রাজতন্ত্র, রাজা প্রসঙ্গ হয়ে পাখী আসে—কখনও বুলবুলি রূপে ধান খেয়ে জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার ফিকির খোঁজে—শিশুকে একটু সঙ্গ দেওয়ার জন্যও ছড়ার মধ্যে পাখীকে আহ্বান করা হয়।

প্রবাদের মধ্যে পাখী বিশেষ স্থান নিয়েছে। কাক, কোকিল, ঘুঘু, পেঁচা, শকুন এরা মানব চরিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সার্থক উপমা হয়ে উঠেছে।

ধাঁধার প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে বারবার নানা পাখীর প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। পাখী ও মাছ কোন কোন ধাঁধায় একীভূত হয়ে গেছে। অভিজাত সাহিত্যে এবং লোকসাহিত্যে শুক পাখীর ধাঁধাগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য।

পাখী

১. কোকিল :

ইউরোপীয় সাহিত্যে নাইটিঙ্গেলের মত ভারতীয় সাহিত্যে কোকিল অবৈধ প্রেম, প্রেম-বিরহ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বাংলা প্রবাদের মধ্যে কোকিলের চরিত্রের দিকগুলি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে—

(১) কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া—এখানে ভিন্ন চরিত্রকে ব্যঙ্গ করা হলেও কোকিলের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিকে কিন্তু অস্বীকার করা হয়নি।

(২) কাক ঝড়ে মরে, কোকিলের কেরামতি বাড়ে—কিংবা কোকিল করয়ে বাস কাক করে বাসা—উক্ত প্রবাদে কাকের থেকে কোকিলের চাতুর্য সার্থকভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

(৩) কোকিলের বউ ছেলে ধরতে জানে না—প্রবাদে কোকিলের ভিন্নতর চরিত্রের কথা ধরা পড়েছে।

বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে কোকিলের প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন প্রয়োজনে—

(ক) কোকিল দূত।

(খ) কোকিল বিরহ উদ্রেককারী।

(গ) নায়িকার চুলের বর্ণনায় কোকিল প্রসঙ্গ।

(ঘ) প্রিয় পাখী কোকিল।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যদেব কোকিল রূপে চিত্রিত।

(চ) বিচ্ছেদের ক্ষণে কোকিলের স্বর কর্কশ মনে হয়।

কোকিল বসন্তের প্রতিনিধি। বসন্ত মিলনের ঋতু। কিন্তু এই ঋতুতে বিরহ অসহণীয়। তাই প্রেমিকা কোকিলকে দূত করে পাঠায় প্রিয়তমের নিকট—

ও তুই যারে কোকিল, যা রে উইড়ে,
    করিস না আর দেরী।
আমার বন্ধু কোথায় গেছে, বলগে গিয়ে বন্ধুর কাছে,
আমি বন্ধু বিনে জীবনেতে মরি।

এক অভাগিনী নারী তার অসহণীয় হৃদয় যন্ত্রণার কথা বন্ধুকে জানানোর জন্য কোকিলকেই দূত রূপে পাঠিয়েছে—

বন্ধুর কাছে যাওরে কুকিল
মোর সংবাদ নিয়া
অভাগিনী নারীর যৈবোন
গ্যালোরে ভাসিয়া।

বসন্তের দূত কোকিল। লোকসমাজে প্রিয় মিলনের ক্ষণ রাত্রি—বসন্ত হোল মিলনের তিথি। এমনই ক্ষণে কোকিল ডাকছে কিন্তু দাদা বিয়ের ব্যবস্থা করছে না। তারই বেদনা ধরা পড়েছে—

আইত্‌তরো নিশাকালে দাদা
গাচোত্‌ কুকিল ডাকে
তাতো দাদা বিয়া না দ্যায় মোকে

কোকিলের রঙ কালো। কিন্তু লোককবি লোকপ্রিয়ার চুলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

কালোত কালো হে
কালোত কুকিলা,
ফেইচকায় বা ধরে নানান ভ্যাস।
তাহার চাইতে অদিক কইন্যা
তোমার মাতার ক্যাশ ।।

কোকিলের বাচ্চা একটি নারীর কাছে প্রিয়। তার কামনা রংপুর জেলার একটি ভাওয়াইয়া গানে প্রকাশিত হয়েছে

কোন জন দরদী হবে।
কুকিলের বাচ্চা পাড়িয়া দিবে
সেই হইবে মোর পরো কালের বান্দোর ।।

ঝাড়খণ্ডী চৈতন্য লীলা বিষয়ক ঝুমুর গানে শ্রীচৈতন্য দেব কোকিল রূপে চিহ্নিত হয়েছেন—

কদম গাছে সোনার ফুল ফুটেছে রে
সোনার বরণ কোকিল ডালে বসে বসে
হরে কিষ্ট গুণ গায়। ২

কোকিল বসন্তের দূত। তার পঞ্চম সুর পঞ্চশরের ন্যায় হিল্লোল আনে যৌবন বক্ষে। বসন্তের মিলন তিথিতে সে আসে মিলনের গান শোনানোর জন্য, কিন্তু বসন্ত এলো, কোকিল গাইল- -কিন্তু প্রিয় যদি না আসে।

কোকিলার পঞ্চম সুরে বিন্ধিছে মোর অন্তরে।
দারুণ বিরহ জ্বালা আর সহিতে নারি গো ।।

অন্য একটি ঝুমুর গানে বিচ্ছেদের ব্যথা—দ্বিগুণ হয়েছে কোকিলের ডাকে—

কোকিলা কুহরে বিদিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূলরে।

মেদিনীপুর জেলার বাঁশ পাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে কোকিলের ডাকে অকাল বসন্তের ছবি ফুটে উঠেছে। যখনই জেগেছে হৃদয়, তখনই আসে বসন্ত—মনের কোণে অকালে ডাকে কোকিল—

দখিনা হাওয়াতে কোকিল ডাকিছে অকালে
ছোকরা বঁধুর মন ভুলাব তিনটি সন্দেশে।

মিলনের ক্ষণে কোকিলের কণ্ঠ সুমধুর মনে হয়। মধুস্রাবী মনে হয় ভ্রমরের গুঞ্জন কিন্তু প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণার মুহূর্তে কোকিলের ডাক হয় কর্কশ। মনে হয় কালো ভ্রমরের গুন গুন শব্দে আছে বিষের ডালি—

নবীন প্রেমে আমায় দাগা দিল
কোকিল পাড়ে ত গালি
ভ্রমরা বিষেব ডালি শবদ শ্রবণ গেল।

২. ময়না :

লোকজগতে ময়না পাখার জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। প্রবাদের মধ্যে কিংবা ধাঁধার মধ্যে প্রায়ই ময়না প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। ছেলে ভুলানো ছড়ায়ও ময়না বার বার উঁকি মেরেছে। প্রবাদে ময়নার চাতুর্যের প্রসঙ্গ নিম্নরূপ—

উত্তর থেকে এল ময়না পাখা নাড়ি নাড়ি
ফুল গাছে বসে ময়না করে চতুরালি।

লোকসঙ্গীতে 'ময়না'-কে নিয়ে জাগতিক তত্ত্বের দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। ময়না এখানে আত্মার রূপক রূপেই ধরা পড়েছে।

ময়নার ময়হা বড়ো ভারীরে
পায়া ময়না সনার খাঁচারি রে
মনে কি হয় না ময়না
যাইতে হোবে উঁড়ি রে।৩

লোকসঙ্গীতে ময়না প্রিয়ার প্রতীক রূপেও ধরা পড়েছে—

ও সাধের ময়না
মন যে ঘরে রয় না।
চাষ আবাদ রইল পড়ে—
চললাম আমি রাজার গড়ে,
আমি কিনব সোনার গয়না
মিটবে তোমার বায়না। ৪

এখানে ছন্দের মিল রাখার দিকটি নেহাত গৌণ নয়। মেদিনীপুর জেলায় রাজার গড়ের নাম কিন্তু গড় ময়না। বাংলা প্রবাদে নিতান্ত ছন্দের

খাতিরে ময়না প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়, যেমন—ময়না ময়না ময়না—সতীন যেন হয় না। জ্বালাময় বহুবিবাহ প্রথা ও সতীন যন্ত্রণার এও এক নিদর্শন। ফরিদপুর জেলার একটি গানে ময়না ও পেঁচার প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে ময়না সুন্দরের প্রতীক। এবং পেঁচা অসুন্দরের প্রতীক -

আমি ময়না বলে পুষলাম যারে
হল সে ভুতুম পেঁচা,
শুনব ময়না পাখীর কৃষ্ণ কথা
এ জীবনে হইল না তা। ৫

৩. ময়ূর ঃ

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের বিখ্যাত পুরাণে, সাহিত্যে, কিংবদন্তীতে লোক গাথায়, সঙ্গীতে ময়ূরের স্থান লক্ষ্য করা যায়। হেলেনীয় পুরাণে রাণী জুনোর সহচর প্রাণীর নাম ময়ূর। প্রিয় ভৃত্য অর্গাস-এর শত চোখ কে রাণী ময়ূরের পালকে চিত্রিত করে দিয়েছিলেন। ঋষি গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রের দেহে ফুটে উঠেছিল সহস্র যোনী—চোখ। ময়ূরের পালকে বোধহয় তারই প্রতিভাস। নাচের জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য ময়ূর খ্যাত। বাংলা প্রবাদে ময়ূরের নাচের কথা দেখি—ময়ূরের নৃত্য দেখি, লেজ নাড়া দেয় ছাতারে পাখী।

আদিম গুহামানব থেকে বর্তমান সভ্যমানুষ, সকলেই ময়ূরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ। তাই বোধ হয় সে আজ জাতীয় পাখী। অতীতকালে ব্যাধের বাড়ীতেও ময়ূর পোষা হোত, আবার ধনীর গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজেও ময়ূর পোষা হোত। পুরুলিয়া জেলার একটি জাওয়া গানে ধনীর গৃহের সৌন্দর্য বর্ধক রূপে ময়ূরকে দেখতে পাচ্ছি—

বড় ঘরের দুয়ারে জড়া ময়ূর ঘুরে গো।
কাল দেখেছি বেলফুলটি আজও মনে পড়ে গো॥

প্রাচীন চর্যাপদেও দেখি ময়ূরের পাখা মাথায় বেঁধে নিজেকে সাজিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেখানে শবরী বালিকা—পাহাড়ের উপর বসে আছে—মাথায় ময়ূরের পুচ্ছ। গলায় গুঞ্জার ফুলের মালা—আমাদের কৃষ্ণ তো মাথায় ময়ূরের পাখা ধারণ করে ময়ূরকে অমর করেই দিয়েছেন।

ময়ূরের পুচ্ছ থেকে লোক শিল্পীরা পাখা তৈরী করেন। তা দেব পূজায় ব্যবহৃত হয়। আবার অনেক ভক্ত ঐ রূপ পাখা নিয়ে নাচতে নাচতে হরিনাম কীর্ত্তন করে—

হাতে তে ময়ূর পাখা, দয়া কর হরি।
মুখে বলে হরি হরি বদন ভরি॥"

কৃষ্ণ নিষ্ঠুর-কালা রূপে লোকসঙ্গীতে স্থান করে নিয়েছেন। ময়ূর ময়ূরী পরস্পরের ভালবাসা বিনিময় করে নৃত্যগীত করে কিন্তু কৃষ্ণ ভালবাসার মর্যাদা বোঝেন না বলে ক্ষোভ করা হয়েছে মেদিনীপুরের বাঁশ পাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে—

ময়ূর ময়ূরী যথা নৃত্যগীত করে
তারাও তাদের রোদন শুনে মন কেমন করে গো
এলো না লম্পট কালা।

৪. ঘুঘু পাখী ঃ

ঘুঘু পাখী সম্বন্ধে লোক অভিজ্ঞতা প্রবাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাদে ঘুঘুর মর্যাদা খুব ভাল নয়। তার প্রমাণ— বাস্তু ঘুঘু, ঘুঘু দেখেছ ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি, দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে কিংবা যার পরে তার খায়, তারি ভিটায় ঘুঘু চরায় ইত্যাদি প্রবাদগুলি।

ধীর গতিতে গাড়ী চালানোর সময় প্রেমের স্মৃতিমূলক এক ধরণের গান গেয়ে থাকেন গাড়োয়ান। তাতে ঘুঘু পাখীর প্রসঙ্গটি এসেছে লোক সঙ্গীতে।

দিনে রাতে গাড়ী চালাই
তবু তোমার দেখা পেলাম না।
যদি হ'তাম কোকতুর* পাখী,
উড়্যা যেতম তোমার কাছে রে
আমার মন মানে না।

(*কোকতুর—ঘুঘু পাখী)

নির্জন দুপুরে প্রণয়লিপ্ত দু'টি ঘুঘু পাখীর সহ অবস্থান গাড়োয়ান মানুষটির মধ্যে প্রেমের সঞ্চার ঘটায়। এ গাড়োয়ান গরুর গাড়ীর। চকিতে তার মনে পড়ে যায় প্রিয়াকে—

দুপুর বেলা দুটি কোকতুর
ডালে বসে থাকে
আমার প্রাণ কাঁদে ও বন্ধুরে।

বর্ণনাকারী- বাসুদেব মাইতি, মোহনপুর
পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

অভিজাত সাহিত্যেও ঘুঘু পাখী নিজের স্থান করে নিয়েছে। খ্রীষ্ট-পুরাণ, হেলেণীয় পুরাণ, ওডেসীতে ঘুঘুর স্থান আছে। ওডেসীতে জিউস ঘুঘুর রূপ ধরে কুমারী **Phthia**-র কাছে গিয়েছিল। ৬

৫. পায়রা :

পায়রা সম্বন্ধে লোক অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত—প্রবাদে বলে—পাখীর ওঁছা পায়রা, জাতের ওঁছা ময়রা—তাছাড়া—কথায় বলে বসন্তের কোকিল আর সুখের পায়রা এরা বর্ষা কিংবা দুখের কেউ নয়। সুখের দিনে এরা ভীড় করে কিন্তু দুঃখের দিনে এদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুখের কালে পালিলাম পায়রা
দুধ ভাত দিয়ারে,
অকালে পালালি পায়রা
গভীর দাগা দিয়া রে। ৭

সঙ্গীতে পায়রা রাজা বলেও চিহ্নিত হয়—

তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো
পায়রা রাজা ঘুরি ফিরি খায়।

৬. বাবুই :

বাবুই পাখীর বাসা যত সুন্দর হোক তবু তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে প্রবাদে—ঘর থাকতে বাবুই ভেজে। কার্ত্তিক পুজোর একটি গানে ধান খাওয়ায় ব্যস্ত বাবুই পাখীর প্রসঙ্গ এসেছে।

এক বাবুই ধলিয়া, আর বাবুই কালিয়া
আর এক বাবুই কপালে তিলক।

৭. **মোরগ ঃ**

শেয়ালের চিরন্তন খাদ্য মোরগ লোকসঙ্গীতে স্বাভাবিক ভাবেই ধরা পড়েছে—

ভাংগা ঘরের ব্যাড়া নাইরে
তাতে শিয়ালের ভয়
শিয়ালে খাইবে তোর মুরগা
দোষের মোর কি ভয়রে।

মেদিনীপুর জেলার একটি অহীরা গানের প্রত্যুত্তরমূলক অংশে দেখা যায় মোরগ যখন প্রথম ডাক দেয় তখন লোকজীবনের ঘড়ির কাঁটায় বাজে চারটা—

কুঁকুড়া ডাকেরে আইরা চারি বাজি
আইলারে বাইসাম বেলায় সিনান করিলি রে
দুপহরে ফুল গাঁথিলি।

লোকসমাজে সকলের কাছে ঘড়ি থাকে না। মোরগের ডাক তাদের সময় নির্দ্ধারণ করে দেয়, বিশেষতঃ ভোর রাতে।

কুঁকুড়া মারিল সিটি
উঠ না গো বহু বিটি
লুজুকি কুটলায় ধান দুটি গো।

পতঙ্গ

১. **ভ্রমর ঃ**

লোককবি বহু বিচিত্র ভাবে লোক জগতের পতঙ্গ ভ্রমরকে লোকসঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন। প্রাথমিক ভাবে ভ্রমর ফুলের মধু খায়, পরাগ সংযোগের ক্ষেত্রে তার অবদান কম নয়। গোয়ালতোড় এলাকার একটি টুসু গানে উক্ত ভূমিকায় ভ্রমরকে দেখা যাচ্ছে।

আঁচিরে পাঁচিরে পদ্ম
নীল পদ্ম বই ফুটে না।
টুসুর হাতে জড়া পদ্ম
ভমরা বই বসে না। ৯

লোকসঙ্গীতে লোককবিরা অসাধারণ জীবন দৃষ্টি নিয়ে ভ্রমরকে দেখেছেন।

চার কুনা পুকুরটি লবং আলতায় ঘেরা
ডাল ভাঙে ফুল তুলে বিদেশী ভমরা

টাঙাইল জেলার একটি আখ্যান গীতিতে বিরহ প্রকাশ করতে গিয়ে কাক ও ভ্রমরের কথা ব্যবহৃত হয়েছে।

বইস্যা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড্যা কাঁদে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবন কালে দাগা॥

মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলে একটি ঝুমুর গানে মধুলোভী ভ্রমরকে দেখা যাচ্ছে—

শতদল শোভিছে জলে ভ্রমর বেড়ায় মধুর ছলে।

অন্য একটি ঝুমুর গানে ভ্রমর প্রেমিকের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। গানটিতে হরি মধুপুরে গেছে, ফলে রাধিকার প্রেম মধু কে পান করবে—তারই আর্তি প্রকাশিত হয়েছে—

প্রফুল্ল আইল ফুল, ভমরা বিণে বিফল
মকরন্দ পড়ে ঝরি ঝরি।
কে করিবে মধুপান, ব্রজে নাই মোর প্রাণধন
ফুল শরে জর জর বাঁচিব কি করিয়া গো
হরি গেল মধুপুরী॥

একটি ঝুমুর গানে ভ্রমরের ছলে প্রেমিকের আগমন কামনা করা হয়েছে—

দুরন্ত বসন্ত কালে আমায় দিতেছে যাতনা
আইল বসন্ত ফুটে ফুটন্ত।
ফুলের মধু ফুলে রইল ভ্রমর কেন এল না।

বিরহমূলক একটি ঝুমুরে মধুলোভী ভ্রমর লম্পট প্রেমিকের সঙ্গে তুলনীয় হয়েছে—

মধু ছাড়া ভ্রমর কোথা যায় না।
ডাল ভেঙে ফুল শুকায় গেলে
ভ্রমর আর তো সেথায় রয় না।

যৌবনে প্রেমিক জোটে, কিন্তু বিগত যৌবনের দিনে সে কোথায় যায়? ভ্রমরকে সামনে রেখে বিরহ-খিন্না এক প্রেমিকার জিজ্ঞাসা—

যখন ফুল ফুটিল ফল ছিল
তখম ভ্রমর আইল গেল
এখন ভ্রমর কোন ফুলে মজিল রে……

২. মশা :

মশার কাজ পোঁ পোঁ শব্দে উড়ে বেড়ান, আর মানুষকে বিব্রত করে দেহ থেকে রক্ত টেনে নেওয়া। এ প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলার একটি চটকা গানে—

ও মদনের মাও
আগুন জ্বালাও মশা মারি পোন্ পোন্ করে।

মশা যেমন দেহ থেকে রক্ত টেনে নেয়, লোকগৃহিণীও স্বামীর পকেট থেকে পয়সা কড়ি টেনে নেয়। তুলনাটি অসাধারণ। প্রসঙ্গটি লক্ষ্য করা যায় মেদিনীপুর জেলার একটি হাবু গানে—

বাবু গো এমন গিন্নী নাইকো কারও ঘরে
সে যে দিনে রাতে
বাবু গো দিনে রাতে মশার মত
আমার পকেট ফাঁকা করে।
হ্যাঁইরে হাঁপু…হ্যাঁইরে হাঁপু। ১০

কীট

১. শুঁয়াপোকা :

শুঁয়া পোকা প্রজাপতির পূর্বরূপ। প্রজাপতি সুন্দর হলে কি হবে, শুঁয়াপোকা কুৎসিত এবং বিষাক্ত। লোককবি অসাধারণ এক তুলনা করেছেন নিম্নের লোকসঙ্গীতে। স্বামীর বাড়ীতে বর ও তার কাকা এক যোগে বধূকে লাঞ্ছিত করে। পরবর্তীকালে স্বামী গৃহ থেকে বিতাড়িত ঐ

নারী বরের কাকাকে শুঁয়া পোকার প্রতীকে দেখেছে। শুঁয়া পোকার শুঁয়া বিষাক্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক, বরের কাকার কর্মও সমগোত্রীয় মনে হয়েছে নারীটির—

শাল বনের শুঁয়া পোকা তুই-ই কি হে
ছেলের কাকা
পথের মাঝে দেখা পেলে বলে দেবে প্রিয়াকে (প্রিয় ?)
কি দোষে ছেড়েছে আমাকে। ১১

২. ছারপোকা :

ছারপোকা একটি যন্ত্রণাদায়ক কীট। মশার মতই মানুষের রক্ত খাওয়া এদের কাজ। লোকসঙ্গীতের মধ্যে রাজনীতিও ঢুকে পড়েছে। ভোটারগণ অযোগ্য পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করেছে। মুর্শিদাবাদের লোক-সঙ্গীতে সেই বিজয়ী অযোগ্য প্রার্থীগণকে কীট-জীব জন্তুর প্রতীকে তুলে ধরা হয়েছে—

যত সব ছারপোকা তারাবেশী ইঁচরে পাকা
আলো জ্বালালে হয় বোকা ঢোকে কাঁথার ভেতরে।
যত সব বাগ হোড়ল তারা হোল ভম্বল
যত সব হাতী ঘোড়া তারা খেল কচু পোড়া
দেখছি আবার কুঁচে কেঁকড়া চেয়ার পেলে অবহেলে। ১২

এই সঙ্গীতগুলি আধুনিক কালের তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

জীবজন্তু

১. টিকটিকি :

টিকটিকির শব্দ যাত্রা পথের বাধা। এই লোকবিশ্বাস মানুষের বহু দিনের। এক গৃহবধূ এই টিকটিকির শব্দে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তাই আপাততঃ সে জল আনতে যাবে না।

খড়ের চালের টিকটিকিটা টিকির টিকির করে
আজ যাব না জল আনতে আমার মন কেমন করে। ১৩

টিকটিকিকে আবার গোয়েন্দা রূপেও লোকসমাজ চিহ্নিত করে—

মহুলে পড়ে টেকা টেকা কুড়াতে পারি নাই একা
টিকটিক দেখে সতীন পালাল
খুঁচের মহল খুঁচেই শুকাল।

এখানে টিকটিক 'খুঁচের মহল' অর্থাৎ যারা দোষ খুঁজে বেড়ায় তাদের দলের লোক। দ্বিতীয় খুঁচ কথাটির অর্থ হতে পারে পেরেক কিংবা দোষের মধ্যে।

২. গিরগিটি :

গিরগিটি বহুরূপী। ক্ষণে ক্ষণে সে তার রঙ বদল করে। মধুলোভী ভ্রমর এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে বেড়ায়—এ দু'জনেই কপট প্রেমিকের প্রতীক রূপে ধরা পড়েছে লোকসঙ্গীতে—

সবুজ বনের গিরগিটিরে তুই
জানি বর্ণচোরা
অন্য বনে পালাই যাবি
ফুলের ভোমরা। ১৪

মাছ

ট্যাংরা ও পুঁটি :

মেদিনীপুর জেলায় মাছ ধরার সময় সমবেত ভাবে যে গান গায় তার মধ্যে মাছের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়—

মাছ ধরেছি ট্যাংরা পুঁটি
বিকতে যাব বাবুর কুঠি
বাবু দিল পয়সা দুটি
তুই লিস না আমি লিব। ১৫

অন্য একটি মাছ ধরার গানে লক্ষ্য করা যায়—

আজ ধরেছি শোল
বাবুর বাড়ীতে হবে ঝোল

আজ যদি পয়সা মিলে
কাল যাব দখিণ বিলে
ধরব ট্যাংরা পুঁটি কই
ওলো হাত চালালো সই। ১৬

জলপাইগুড়ি জেলার একটি চটকা গানে ইলিশ মাছের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে—যদিও সংসার রক্ষা করে অন্যান্য মাছ—

মাছের মধ্যে মাছ সেনে ইলিশা সেনে মাছ
ও তোর রুই ওক পোচে কে?
চান্দা ধুতুরা মাচে সংসার রাইখাছে
ও মদনের মা ও।

কুমীর ঃ

কুমীর মানুষ খেকো একটি প্রাণী। জলে এদের বাস। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ কুমীরকে ভয় পায়। লোকজীবনে লোকসঙ্গীতের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছে। রংপুর জেলার একটি ভাওয়াইয়া গানে দেখা যাচ্ছে—

কালো নদীত কুমীরের ভয়
মানুষ গরু ধরিয়া খায়
ওহে কইন্যা
এই দরিয়া ক্যামনে হবো পার।

চট্টগ্রামের একটি মাইজ ভাণ্ডারী গানে কামনাকে কুমীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

কাম কুমীর যে মাইরতে পারে
সাধু লইয়া খেইলতে পারে
না দিলে কি নিতে পারে ফকিরের মতি।

বাংলাদেশ নদী প্রধান অঞ্চল বলেই সেখানে লোকমানসে কুমীর স্বতঃই ছায়া ফেলেছে। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত লোকসঙ্গীতে কুমীরের প্রভাব নিতান্তই গৌণ। ঢাকা জেলার একটি বাইলাস্তি গানে কুমীরকে কালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

কাল কুম্ভীরে যে মাইরতে পারে
সাধু লইয়া সে খেলা করে।

কূর্ম ও কাঁকড়া :

মালদহ জেলায় চৈত্র গাজনে শিব মূর্তি গঠন করার সময় যে গান গাওয়া হয় তাতে কাঁকড়া ও কূর্মের প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। এই গান গুলিতে পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে লোকজ্ঞান ধরা পড়েছে—মনে হয় গানটি প্রাচীন—

নাছিল জল স্থল দেবের মণ্ডল।
কোন রূপ ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যাকার।
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে,
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।
তিল পরিমাণ মধ্যে বেশ পরিমাণ
কূর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল সৃজন।

হরিণ :

আদিম মানব মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখেছিল হরিণের দিকে। তার দেহ সৌষ্ঠব—তার চলার ছন্দ সবই মুগ্ধ করেছিল লোক কবিকে—

হরিণের দুটো শিং
হরিণ চলে তিরিং তিরিং

বলদ :

আদিম মানুষ আপনা থেকেই এক সময় কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল। বলদকে জুড়ে দিয়েছিল লাঙলে। এটাই মাটি চষার প্রাচীন এক পদ্ধতি। ঝাড়খণ্ডী পাতা নাচের গানে কৃষিজীবী সমাজের বলদও অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে—

উগাল সামাল তিন চাষ
জমিনে যেমন না হয় ঘাঁস,
ঘাঁস হলে চাষ হবেক কেমনে?
দু'টি বলদ চালাও সমানে।

মুর্শিদাবাদের একটি সঙের গানে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গানটিতে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক রূপে জোড়া বলদের প্রসঙ্গে এসেছে—

কাপড়ের দর দেখে ফেটে যায় হিয়ে,
ইজ্জত ঢাকতে হয় বুঝি আউস খড় দিয়ে
চা বিস্কুটে কত জনার রেখেছে মান।
তালের তাড়ি না থাকলে কতজনা হত চিৎপটাং।
জোড়া বলদ পাল্টে গেল হল তারা হতাশ,
ফাওড়া হাতল নিসে দাদা কর এবার চাষ।

গানটিতে জোড়া বলদ—কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক প্রতীক। ফাওড়া হাতল প্রতীক আর. এস. পি. দলের। এখানে আর. এস. পি. দলের জয়ের কথা বলা হয়েছে।

গাভী :

লোকসঙ্গীতে প্রাত্যহিক জীবনের দৈন্য হতাশা ব্যথা-তুচ্ছতা, সবই ধরা পড়েছে। লোকসঙ্গীতে গাভীর প্রসঙ্গ বহু লক্ষ্য করা যায়। ফাঁকিবাজ এক রাখালকে কর্মে অবহেলার জন্য ভৎর্সনা করা হয়েছে একটি গানে, প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে গাভীর কথা—

অহড়ে বহড়ে বাগাল গাই চরালি কোথারে
খুরে না লাগিল কাদা, জল খাওয়ালি কোথারে

গানটিতে সমাজ জীবনের একটি ছবি ফুটে উঠেছে। এক সময় গ্রাম্য অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তির গৃহে অনেক গরু মোষ থাকত তাকে চরানোর জন্য বাগাল রাখা হোত। এখনও কোথাও কোথাও এ ব্যবস্থা চালু আছে। তবে দিনে দিনে তা কমে যাচ্ছে।

ইঁদুর :

কড়া খেলা একটি আদিম নৃত্য গীতের সমন্বয়। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার পরবর্তী দ্বিতীয়াতে মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশে গরু মোষকে খুঁটিতে বেঁধে মৃত গরু মোষের চামড়া পরে তার চোখের সামনে নানান অঙ্গভঙ্গি সহকারে দেখান হয় এবং লাঠি দিয়ে গরু মোষকে খুঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে আদিবাসীরা বাদ্য গীত সহকারে নৃত্য গীত করে। এ জাতীয় একটি গানে কর্ত্তব্য রত ইঁদুরের ছবি ভেসে উঠেছে—

বাড়ী দিগে যেও না, ভাই কালাচাঁদ
ইঁদুরে বইছে গড়াধনে
ও ভাই কালাচাঁদ, ইঁদুরে বইছে গড়া ধন।

উক্ত প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন—ফলে গানটিও প্রাচীন বলে অনুমান করা যায়। প্রথাটির মধ্যে আদিম মানবের একটি বিশেষ বোধ কাজ করেছে। বুনো বাঘ সিংহকে যাতে গরু মহিষ হঠাৎ ভয় না পায় তাই তাদের সাহস বাড়ানোর জন্য কৃত্রিম ভয়ের একটি আবহ সৃষ্টি করে ঐরূপ আদিম নৃত্যগীত করা হয়ে থাকে।

বিড়াল ঃ

বিড়াল বাঘের মাসি হলেও ক্রমে ক্রমে লোক জীবনে গৃহপালিত জন্তু হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। বিড়াল দুধ চুরি করে, মাছ চুরি করে খেয়ে নেয় বলে মানুষ বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়াতে চায়। লোকগীতিতে রঙিলা বিড়ালকে তাড়ানোর একটি ছবি—

কোণ্টা বাড়ীর আইলোত
বিলাই করে ম্যাঁও ম্যাঁও
ধাঁয়স মনসা ছাওয়াটা মোর
বিলাই খ্যাদে দ্যাঙ
কার ঘরের অংগিলা বিলাই রে।

বাঘ ঃ

মানুষের কাছে বাঘের ভীতি চিরন্তন। কিন্তু লোকগীতিতে বাঘের কান কেটে দেওয়ার বীরত্বও কম নয়।

আসুক আসুক বাগা ব্যাটা
কাটিম তার কান।
অই বাগায় খায়া গেইচে
মোর বাটার পান॥

এই বীরত্ব কিন্তু বাটার পান খেকো বাঘের কাছেই সম্ভব।

পশুরাজ সিংহ হলেও লোকসমাজ বাঘকে বনের রাজা করে ফেলেছে। প্রসঙ্গক্রমে লোককবি অসাধারণ এক উপমা ব্যবহার করেছেন—

আঁক বনের শিয়াল রাজা বনের রাজা বাগ
আর বিহা ঘরের ম্যায়া রাজা সমান খুঁজে ভাগ।

লোকসঙ্গীতে বাঘ কখনও কখনও হয়ে ওঠে বাঘা। নিম্নের গানটিতে

নারীর বীরত্বের কাছে ভয় পেয়েছে বাঘ। এই গানটি অতীতের স্ত্রী শাসিত সমাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়

বাঘায় বলে বাঘুণী, কিসের ঢোল বাজে
অমুক গাঁয়ে নারী লোক আইজেব রণে সাজে।
বাঘায় কান্দে রে……

এক কুৎসিত নারী মনের ছবি ভেসে উঠেছে নিম্নের লোকসঙ্গীতে

স্বামী গেছে ধান কাটতে বাঘে ধরে খাক
ছোট দেওর বেঁচে থাক।

পাঁঠা ঃ

নির্বাচিত অযোগ্য পঞ্চায়েতকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে নিম্নের গানটিতে। গ্রাম-প্রধানকে পাঁঠার প্রতীকে প্রকাশ করা হয়েছে।

আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা
পঞ্চায়েত হ'ল্য ক্যে ?
বাপের নাম লিখতে ভুলে
পাঁঠার মত যা পায় গিলে
ছাগল বেটা রাজা হল্যে
সঙ্গীরা সব ডাকবে ভ্যা ভ্যা॥

ভোটের কাছাকাছি সময়ে এই জাতীয় গান হামেশাই শোনা যায়। কোন কোন স্থানে ছড়া আকারে দেওয়াল লিখনের মধ্যেও এ সব গান পাওয়া যায়। উক্ত গানগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের।

শেয়াল ঃ

প্রাণীদের মধ্যে শেয়াল চিরদিন ধূর্ত। লোকের বাড়ী থেকে মুরগী ধরে নিয়ে যায় শেয়াল—

ভাংগা ঘরের ব্যাড়া নাই রে
তাতে শিয়ালের ভয়
শিয়ালে খাইবে তোর মুরগা
দোষের মোর কি ভয়রে।

চর্যাপদের গানগুলির মত সন্ধ্যা ভাষার সাংকেতিক একটি ভাওয়াইয়া

গানে (রংপুর) বাঘের থেকে শেয়াল শক্তিশালী। বাঘ হরিণ লাঙল টানে মাকড়সা সেখানে কৃষক।

শিয়াল দ্যাকি বাঘ পলেয়া গ্যালো
হাসিয়া মইলো পাটা
ও মনু রায় ও
বাগ হরিণে হাল খ্যান জুড়িলাম
... ...
মাকড়া হইলো কৃষাণ।

হনুমান :

মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলে প্রচলিত করম সঙ্গীতে প্রশ্নোত্তর মূলক একটি লোকসঙ্গীতে হনুমান প্রসঙ্গ দেখা যায়—

প্রশ্ন— কোন ঘাটে নাম হে রাজা দশরথ লাল।
চিকন কালারে, কোন ঘাটে নামে হনুমান॥

মালদহ জেলার শিবের গাজনে শিব প্রণামের একটি সঙ্গীতে হনুমানের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়—

লঙ্কা গেল হনুমান খায় আম্রফল
মর্ত্যে ফেলিল আঁটি তাহাতে হইল বৃক্ষ অমরাবতী।

সাপ ও ব্যাঙ :

সাপকে ব্যাঙ চিরদিন ভয় করে তারই বাস্তব চিত্র এঁকেছেন লোক-কবি—পুরুলিয়া জেলায় একটি টুসু গানে—

পুরুলিয়াতে দেখে এলাম ব্যাঙের হাটে কাছারি।
সাপ দেখে ব্যাঙ পালায় গেল পড়ে রইল কাছারি॥

সাপ :

গরীব মানুষের কুঁড়ে ঘরের বাঁশের বাতা যাতে ভেঙে না যায় তার জন্য সাপের ভয় দেখান হচ্ছে।

টুসু দেখতে আলি তরা
ধরলি লো চালের বাতা,

বাতায় আছে কাল খরিস
খাবে লো তোদের মাথা।

বনে কাঠ কুড়াতে কুড়াতে এক ধরণের গান গায় মেয়েরা—

ও বনে খরিস সাপ
ও বনকে যাব না।
তোর পিরীত কালকূট বিষ
তোর পিরীতে মজব না॥

একটি জাওয়া গানে সাপে কাটার কথা এসেছে -এবং লোক-চিকিৎসা হিসেবে যাদু বিদ্যা না জানার কথাও এসে গেছে।

শাক তুলতে গেলে বৌ
ডুমুর তলে বাড়ী গো।
কি সাপে কামড়ালো গো
না জানি মন্তর গো॥

সাপ দেখলে আমরা ভয় পাই। তার সঙ্গে বাস করতে চাই না। জল আনার সঙ্গীটিও মাঝে মাঝে গোলমাল পাকায় -তাই সাপের মতই তার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে চায় শান্তিকামী অপর সঙ্গীটি—একটি টুসু গানে দেখি—

তিতি সাপের উল্কি লেখা
ঢ্যামনা সাপের কুঁড়েলি।
তোর সঙ্গে ভাই জলকে যাব না
গণ্ডগোল লাগাতে ভাই আর পারব না॥

উল্লেখপঞ্জী

১. **Folk tales of Bengal—The Rev., Lal Behari Dey, P-p3-107.**
২. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—বিনয় মাহাতো, পৃঃ ২৮৭।
৩. বিহঙ্গচারণা—ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃঃ ১৩৫।
৪. নিজস্ব সংগ্রহ—হোগলাবাড়ী, মেদিনীপুর।

৫. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৬৭।

৬. বিহঙ্গচারণা—ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃঃ ১৬৩।

৭. পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য—উৎস ও অভিপ্রায়, ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা-৯, ১৯৬৯।

৮. নিজস্ব সংগ্রহ—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

৯. নিজস্ব সংগ্রহ—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।

১০. নিজস্ব সংগ্রহ—গোবর্ধনপুর, মেদিনীপুর।

১১. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১১।

১২. মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য—পুলকেশ সিংহ, পৃঃ ৯০:

১৩. নিজস্ব সংগ্রহ—ডিঙ্গল, মেদিনীপুর।

১৪. ঐ

১৫. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—২য় খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৬৯।

১৬. নিজস্ব সংগ্রহ—ময়না, মেদিনীপুর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকসঙ্গীতে সৌরজগৎ ও প্রকৃতি

সৌরজগৎ মানুষের কাছে চিরদিন বিস্ময়ের বস্তু। বিস্ময়ে, ভয়ে, আবেগে মানুষ আদিম কাল থেকে তাকিয়ে থেকেছে আকাশের দিকে। চন্দ্র, সূর্যকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা ও নিবেদন করেছে। মেঘ, বৃষ্টি-এরাও দেবতার আসনে বসেছে। এদের অধিপতি করা হয়েছে কাউকে কাউকে। ভয়, ভক্তি, ভালবাসা বিভিন্ন অনুভূতি দিয়ে লোক-জগৎ এক অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করেছে সৌর জগৎকে।

লোকসঙ্গীতের মধ্যে দেখা গেছে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে সৌরজগৎ উপস্থিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানেরও ছোঁয়া যে নেই তা অস্বীকার করা যাবে না। লোকসঙ্গীতে সৌরজগতের সম্পর্ক নির্ণয়ে নৃ-তাত্ত্বিক দিকটি প্রায় অনুপস্থিত থেকে গেছে। বরং উপমা চিত্রকল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহিত্যিক দিকটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। সৌরজগৎ সম্পর্কে লোকজগতের ভয় শ্রদ্ধা-ভক্তি জনিত চেতনা লোক-সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না।

আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, বিদ্যুৎ, মেঘ এরা এসব সৌরজগতের। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ অগাধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে সৌরজগতের দিকে। বর্তমান বিজ্ঞান মহাকাশের অনেক বিস্ময়ের সমাধান করার চেষ্টা করেছে কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে এখনও দেরী আছে। লোককবি লোকসঙ্গীতের মধ্যে সৌরজগতের মধ্য থেকে নানান উপমা সংগ্রহ করেছেন। লোকগানে নবজাত শিশুকে মহাকাশের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

(ক) চাঁদ ও তারা :

ঘরের শোভা আঁচির পাঁচির
বিলের শোভা ধান।
কলের (কোলের) শোভা ছট ছেল্যা
যেমন লই তন চান। (চন্দ্র)

নবোদিত চাঁদের সঙ্গে নবজাতকের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন লোককবি। এই সাদৃশ্য বোঝাতে কবি সৌরজগৎ হাতড়ে বেড়িয়েছেন। লোককবি লোকপ্রিয়াকে নানান আভরণে সাজাতে চান। সে আভরণ তিনি সংগ্রহ করতে চান মহাকাশ থেকে। উত্তর রাঢ়ের একটি আলকাপ গানে দেখি—

ওগো আমি তারা তুলে পরাবো
করবো চুলে চুরি চাঁদের হাসি। ২

আকাশের চাঁদ পৃথিবীতে ঢালে অমৃতধারা, পরকীয় প্রেমিক প্রেমামৃত দান করতে চায়। কিন্তু ননদিনীর প্রখর গালি-গালাজ কুলবধূকে বাধা দেয় ক্ষণে ক্ষণে। মেদিনীপুরের আমদান অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে দেখি—

সুধাকর সুধা দেয় নাগর দেয় প্রেম।
ননদিনী গালি দেয়
ক্যেমনে করি প্রেম রে। ৩

আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি। প্রিয় চাঁদ লজ্জায়—ভয়ে বোধহয় মুখ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। এমনি ক্ষণে প্রেমিকাকে ত্যাগ করেছে প্রেমিক—

আকাশেতে বিজলী মারে
চাঁদ লুকায় মুখ,
প্রিয় আমায় ছেড়ে গেল
গেল আমার সুখ সখীরে...... । ৪

চাঁদনী রাত। ঝিকিমিকি তারার মৃদু আলো এসেছে পৃথিবীতে। এখনই তো প্রণয়ের রহস্য উন্মোচিত হওয়ার উপযুক্ত সময়। কিন্তু প্রিয়াহীন এই ক্ষণ—বড়ই বেদনাদায়ক।

চাঁদ উঠেছে আকাশেতে ফুটছে কত তারা
কি ভাবে কাটবে রাত
হয়ে প্রিয় হারা
ও বঁধু হে...... । ৫

চাঁদ মিলনকে মধুর করে। বেলপাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে সৌরজগতের পূর্ণ শশীর কথা স্মরণ করা হয়েছে।

প্রতি দিন পূর্ণ শশী যদি হইত উদিত
বিচ্ছেদ বিরহানল যদি না থাকিত
তবে কি সুখ হইত। ৬

ভাদু গানের মধ্যে মহাকাশযানের প্রসঙ্গ এসেছে। ভাদুকে চাঁদে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত তার ভক্তবৃন্দ। এই ভাদু সঙ্গীত আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত। মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর অঞ্চলে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এই গানটি—

আমার ভাদু রকেট চাপে হে
ভাদু আমার চাঁদে যাবে হে। ৭

এই বিজ্ঞান সচেতনতা লোক জীবনের ঝুমুর গানকেও প্রভাবিত করেছে। প্রেমের টানে প্রেমিক সৌরজগতের চাঁদ, মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত যেতে রাজী। কিন্তু প্রেমিকাকে সে ত্যাগ করতে রাজী নয়। সে জানে বিরহের জ্বালা কত তীব্র

শুন বঁধু চাঁদে যাব
নয়তো মঙ্গল গ্রহে যাব
তবু বঁধু তোমার সঙ্গ ছাড়ব না
বুঝবে কি হে প্রেমের যাতনা। ৮

গোয়ালতোড় এলাকার একটি টুসু গানে খেমটি গান জানা এক গায়কের মনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আকাশের চাঁদ ও জ্যোৎস্নার কথা বলা হয়েছে—

কইলকাতার ডিগি তবলা
আনন্দপুরে সারাব,
যত টাকা লাগে লাগবে
ইস্কুলে নাম লেখাব
চাঁদের গায়ে চাঁদনি—
নূতন বায়েন বাজাও তোমার হারমণি,
আমি নূতন খেমটির গান জানি। ৯

এক অভাগিনী নারী কোকিলকে দূত করে তার প্রাণবন্ধুর কাছে পাঠাচ্ছে। তার কাছে নিশাকালের বিরহ অসহনীয়—

আকাশেতে ওটে চাঁদ
সাতে নিয়া তারা,
এ হ্যান নারীর যৈবোন—
ছাড়িয়া না যায় ছাড়ারে। ১০

রাতের আকাশের শোভা চাঁদ। সে না থাকলে হাজার তারা তার শূন্য স্থান পূরণ করতে পারে না। তেমনি যে দয়িতের ঘরে দয়িতা নেই তার জীবন তো মৃত্যুরই নামান্তর—

আকাশেতে চাঁদ নাই
কি করিবেক তারা,
যার ঘরে সঁয়া নাই
জিয়ন্তে সে মরা। ১১

কৃষ্ণকে গোপীগণ ঘিরে রেখেছে। লোককবি তার তুলনা দিতে গিয়ে মহাকাশ থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন।

চাঁদকে যেন তারায় ঘেরে
এমনি ঘেরেন গোপীগণ। ১২

(খ) চন্দ্র-সূর্য :

পাতানাচের একটি গানে 'চন্দ্র ও সূর্য''কে একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

সূর্য উঠে ঝিকি মিকি চাঁদ করে আল,
পুঁটি ঝুমকি চাঁদ বিনে দুনিয়া আঁধার। ১৩

মেদিনীপুরের গোয়ালতোড় অঞ্চলের একটি টুসু গানে সূর্যের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হোল—শেষ লাইনটি "সুরযের মধ্যে ছিল আগুন তারে এসে লেগেছে" সৌর শক্তি থেকে কি তারে আগুন জ্বললো! এই চেতনা লোকশিল্পীর মনে কি ভাবে এল? টুসু গানটি এই রকম—

ওগো দিদি হরিণ ঘাটাতে
কত নীল লাল আগুন জ্বলিছে।
সরকারের এমনি বুদ্ধি
তারে আগুন জ্বালাচ্ছে
সুরযের মধ্যে ছিল আগুন তারে এসে লেগেছে। ১৪

বাংলা দেশের একটি লোকসংগীতে নায়িকার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সূর্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। পূর্ব আকাশে সোনা রঙ ছড়িয়ে যেমন সোনালি সূর্য দেখা দেয় নায়িকার রূপও তেমনি সুন্দর।

ওরে পূবোত য্যামোন
ভানুর ওদোয় হয়,
অই মোতোন জ্বলচে উপ (রূপ) মোর
ওলুক জানীর গায়। ১৫

সৌরজগতের চন্দ্র সূর্য লোককবিকে প্রায়ই আলোড়িত করে। পৃথিবীর কুমুদিনী যেন চাঁদ-প্রিয়া, সূর্যকে মনে হয়েছে দিবার পত্নী—কেননা সূর্য ব্যতীত দিবা তো অন্ধকার। বাঁশপাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে দেখা যায়—

চন্দ্র বিনে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হলেন অকারণ
সূর্য বিনে দিবা পত্নী বিনে নব যুবা। ১৬

(গ) গ্রহণ :

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের প্রসঙ্গও লোকগীতিতে এসেছে তাত্ত্বিক জ্ঞান হিসেবে। ঢাকা জেলার একটি বাইলাস্তি গানে·

মাহুতে বলে
সে সময়ে চন্দ্র সূর্য গ্রাস কইরবে,
সমন বন্ধেতে লাইগবে দুটি গ্রহণ
এক যোগে আঁধার হবে দেহ ঘর
চাইর চন্দ্র সাধন কর। ১৭

(ঘ) বিদ্যুৎ :

আকাশে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়ে আবার হারিয়ে যায়। এর নাম তাই ক্ষণপ্রভা। লোকসঙ্গীতে নানান উপমায় এই বিদ্যুতের প্রসঙ্গ এসেছে। চৈতন্য বিষয়ক একটি ঝুমুর গানে শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনায় বিদ্যুতের প্রসঙ্গ এসেছে—

আমার মনের মানুষ এসেছে গো
ও তোরা দেখবি যদি আয়,—
তার রূপেতে ভুবন আলো
ঝলকে বিদ্যুৎ লুকায়। ১৮

আকাশের মেঘ বিদ্যুৎ জনজীবনকে আলোড়িত করে। তারই প্রকাশ ঘটেছে নিচের লোকসঙ্গীতে। আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, তাই নায়িকা ব্যস্ত ঘরে ফেরার জন্য। নবীন "নাইয়াকে" সে অনুরোধ করে—

ওত্তোর (উত্তর) কল্লে ম্যাঘ ম্যাঘালী
পশ্চিমে চিলকিয়া (বিজলী চমকায়) উটিল দেওয়া
পার কর হে নবীন নাইয়া
আন্দার করিয়া আইলো দেওয় ।

অন্য একটি গানে দেখি

নউতোন (নূতন) পিরীতির বড় জ্বালা
দেওয়ায় করিলো ম্যাঘ ম্যাঘালি রে
ও তার ফরকিয়া (বিদ্যুৎ চমক) উটিল দেওয়া।

নারীর রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায়ই মহাকাশ থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন লোককবিগণ। একটি ঝুমুর গানে অজানা এক নারীর বর্ণনায় দেখি—

কে জানে কারি বালা রূপে জিনি চপলা
দন্তরাজি মুক্তা পাতি ভাইরে।
ঘেরে নব মেঘ যেন সৌদামিনীরে।

সিঁদুরের বিন্দুর সঙ্গে সৌদামিনীর ঔজ্জ্বল্য তুলনীয় হয়েছে বেল-পাহাড়ী অঞ্চলের একটি ঝুমুর গানে- -

সিন্দুরের বিন্দু ভালে যেন সৌদামিনী

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যুতের চমক-বিরহ-অভিসার ইত্যাদির যেমন ছড়াছড়ি তেমনি বাংলা লোকসঙ্গীতেও বিরহ জেগেছে বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে—

ঘন ঘটা রাতিয়া চমকে বিজুরিয়া
থাকি থাকি উঠে বিরহ আগুলিয়া।

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে বিরহ প্রকাশ করতে গিয়ে সৌরজগতের মেঘ আর শশীর প্রসঙ্গ এসেছে—

তরু সব ফলে ফুলে, বিজলী মেঘের কোলে
নিশি কোলে শশী খেলে, আমি মরি যাতনায়

উক্ত লোকসঙ্গীতে অনুপ্রাস 'ল'-এর ব্যবহার অত্যন্ত সুচিত্রিত। তাছাড়া এখানে যে চিত্রকল্প ব্যবহৃত তা যে কোন আধুনিক শিক্ষিত কবির ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছে।

(ঙ) আকাশ-মেঘ :

লোককবি মহাকাশ আর পার্থিব প্রকৃতিকে পাশাপাশি রেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন—

নীল আকাশের কূলে দীঘির কালো জলে
দীঘির স্তরে স্তবে পদ্ম ফুটে রয় ।

প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের পাখী আকাশে উধাও হয়ে যায়। বিরহিণী এক নায়িকা বলে ওঠে—

পাখী বলে যাও রে
নীল আকাশে মন উল্লাসে
কোন বা দেশে যাওরে পাখী বলে যাওরে ।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর আকাশে মেঘ দেখা দেয় তখন ভল্লা ধাঙরের কণ্ঠে মেঘের গান ফুটে ওঠে :

কালো মেঘে মেঘে আড়াল হতে ওলো
কার হাসি ফুটিল গো !

(চ) আকাশ-তারা :

আকাশের নক্ষত্র—তাকেই লোক বলে তারা। এখানে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে কোন জ্যোতিষ্ককে আমরা দেখব না। আমাদের দৃষ্টি হবে ভাবের দৃষ্টি। লোককবির কাছে আকাশের তারা দেখতে সুন্দর ঠিকই কিন্তু দীর্ঘ খরা যখন চলে—শুরু হয় অনাবৃষ্টি তখন তারার সৌন্দর্যের কি মূল্য আছে ?

আকাশেতে জল নাই
কি করিবেক তারা
বঁধার মন চঞ্চল
ছাড়ো যাবার পারা।

তারা ঝিলমিল রাত। অনন্ত সৌন্দর্যের রাত। কিন্তু বিরহিণী নারীর কাছে তা শুধু ব্যর্থতাই আনে—

নারীর মোন মোর উতাল পাতাল করে।
এ্যাকনা তারা দুকনা তারা
তারায় ঝিলমিল করে
এ্যামোন সোনদোর আইত কোনা যায়···

(ছ) **প্রকৃতি :**

আদিম মানুষ থেকে বর্তমান সভ্য মানুষ পর্যন্ত মানুষের যে জয়যাত্রা তাতে প্রকৃতি জগতের অবদান নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। প্রকৃতি জগতের রূপান্তর ঘটে ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে। মানুষের মনের পরিবর্তন হয়, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে। নানান ঋতু থেকে নানান উপমা গ্রহণ করা হয়েছে লোকগীতিতে—এর দ্বারা লোক জগতের মানস পরিবর্তন ও ভিন্নতর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) **বসন্ত ঋতু :**

নারীর যৌবন বর্ণনায় লোককবি প্রকৃতি থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন। এখানে উপমান হোল বসন্ত ঋতুর কাঁটাল—

কাঁটালের বসন্ত কালে
কাঁটালে ফ্যালায় মুচি,
নারীরও বসন্ত কালে
মুকে মুচকি হাসি রে।

বসন্তে ফোটা ঘাসের সঙ্গে নারীর কবরীর উপমা প্রকাশিত হয়েছে –

ঘাসের বসন্ত কালে
গবরা* থোপা থোপা,
নারীরো বসন্ত কোলে
তুলিয়া বান্দে খোপারে।

(* এক প্রকার ঘাস)

(২) **শীত :**

শীতের সময় আসে টুসু পরব। একটি বোন সারা বছর অপেক্ষা করে আছে শীতের পরবে তার ভাই এসে তাকে বাবার বাড়ী নিয়ে যাবে। কিন্তু সব আশা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তার হতাশার ছবি কদমডিহা—ধরমপুর অঞ্চলের টুসু গানে প্রকাশিত হয়েছে—

আশা করে বসে আছি সারা বছর ধরে
এত বড় শীত পরবে লিতে আলি নারে।

(৩) **বর্ষা :**

বর্ষা ঋতুতে কৃষি কাজ শুরু হয়। ঐ সময়ে এক নারী নীচু মাঠের

দিকে গিয়ে বেশী মজুরীতে কাজ করবে এবং রথের মেলায় ব্লাউজ কিনবে--এই আশার কথা নিম্নের গানটিতে প্রকাশিত—

বর্ষাকালে নামাল যাব
বেশী দামে মজুর খাটব,
রঙীন রঙীন বেলাউজ লিব
মুনিব গড়েব রথে রে। ১৯

উল্লেখপঞ্জী

১। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান—ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, পৃঃ ৮১।
২। উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত--দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮২।
৩। নিজস্ব সংগ্রহ—ঝুমুর—আমদান, মেদিনীপুর।
৪। ঐ
৫। ঐ
৬। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—২য় খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৫৬।
৭। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।
৮। নিজস্ব সংগ্রহ—ঝুমুর—আমদান, মেদিনীপুর।
৯। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।
১০। লোকসাহিত্য--একাদশ খণ্ড, সঃ—বদিউজ্জামান বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৯৩।
১১। ঝাডখণ্ডী লোকভাষার গান—ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, পৃঃ ৭৬।
১২। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত—রত্নাকর (২) আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃঃ ৮২১।
১৩। লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—বিনয় মাহাত, পৃঃ ৯১।
১৪। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—গোয়ালতোড়।
১৫। লোকসাহিত্য—একাদশ খণ্ড, সঃ বদিউজ্জামান, ঢাকা, পৃঃ ৭১।
১৬। লোকসাহিত্য—চতুর্দশ খণ্ড, সঃ আলমগীর জলীল, পৃঃ ২০।
১৭। উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত—দীলিপ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৮২।
১৮। নিজস্ব সংগ্রহ—টুসু—কদমডিহা, মেদিনীপুর।
১৯। নিজস্ব সংগ্রহ—মুনিবগড়, মেদিনীপুর।

সপ্তম অধ্যায়

গণজাগরণমূলক লোকসঙ্গীত

গণজাগরণের ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সঙ্গীত মানুষেব প্রিয় বস্তু বলে সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো সহজতর। তাই সর্বযুগে এই মাধ্যমটিকে গণজাগরণের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা হোত। সমাজে যখনই কোন আন্দোলন দেখা দেয়, তখনই লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়। অপরপক্ষে মানুষ এই সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজের ভাব প্রকাশ করে, নিজেকে ও অন্যকে সচেতন করে। গণজাগবণমূলক লোকসঙ্গীতগুলি লোকমানসের জাগ্রত চেতনার বহিঃপ্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, রামমোহনেব সতীদাহ প্রথার বিলোপ ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে নানান লোকসঙ্গীত রচিত হয়েছে। তবে সমাজের কল্যাণকর লোকসঙ্গীতগুলি স্থায়ী হয়েছে। অন্যগুলি কালস্রোতে হারিয়ে গেছে। এমনও লক্ষ্য করা গেছে—এক আন্দোলনে যে গান জনপ্রিয় হয়, সেই সুরে ভিন্ন কথা বসিয়ে নতুন লোকসঙ্গীতও রচিত হয়।

গণজাগরণমূলক গানগুলি ধর্মীয় সামাজিক, জাতীয় কিংবা রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা পুষ্ট হয়। অনেক সময় দেখা যায় গণজাগরণমূলক লোকসঙ্গীতের সঙ্গে গণসঙ্গীত মিশে একাকার হয়ে যায়। এই দুটি বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লোকসংগীতে ভাষা ও সুরের মধ্যে আঞ্চলিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু গণসঙ্গীতের ভাষায় সুরে, বিকাশে, প্রকাশে, আবেগে একটা পরিশীলিত মননের ছাপ পাওয়া যায়। গণসংগীতে আঞ্চলিকতার ছাপ থাকে না।

লোকসঙ্গীতে কোন কোন ক্ষেত্রে অশ্লীল শব্দও প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু গণসংগীতে কোন অবৈজ্ঞানিক চেতনার বা অশ্লীল ভাষা প্রকাশের সুযোগ থাকে না।

গণসংগীতের বিষয় সাধারণতঃ শোষণ মুক্তি, শ্রমিক শ্রেণীর

নবমূল্যায়ন, মালিক শ্রমিক সংঘাত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান, প্রচলিত সমাজ নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইত্যাদি। কিন্তু লোকসঙ্গীতে বিষয়ের কোন সীমাবদ্ধতা নাই।

স্বদেশ প্রেমমূলক লোকসঙ্গীতগুলি অনেকক্ষেত্রে গণসঙ্গীতের মতই মনে হতে পারে। কিন্তু স্বদেশ চেতনার গণজাগরণ মূলক লোক-সঙ্গীতগুলিতে আছে সাম্রাজ্যবাদী হাত থেকে দেশের মুক্তিচিন্তা, কিন্তু গণসঙ্গীতে আছে দেশের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শোষণ মুক্তির কামনা। স্বদেশ সঙ্গীতে ধর্মীয় ভাবনা স্থান পেতে পারে, গণসঙ্গীতে ধর্মীয় ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

স্বদেশ সঙ্গীত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি রচনার হলেও বহু স্বদেশ সঙ্গীত ব্যক্তিকে অতিক্রম করে গোষ্ঠীর ভাবমূর্তিকেই প্রকাশ করে।*

গণসঙ্গীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সুরকে মিশ্রিত করে এক নতুন উদ্দীপক সুরের মাধ্যমে গণচেতনাকে উদ্বিগ্ন করার চেষ্টা করা হয়। লোকসঙ্গীতের সুর নিজ আঞ্চলিকতায় মণ্ডিত।

বাংলা ভাষায় বিচিত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে গণজাগরণমূলক লোক-সঙ্গীতগুলি রচিত। যেমন—

১। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ মূলক লোকসংগীত।
২। অস্পৃশ্যতামূলক লোকসংগীত।
৩। স্বদেশী চেতনামূলক লোকসংগীত।
(ক) সাম্প্রদায়িক হাংগামা বিরোধী লোকসংগীত।
(খ) অসাম্প্রদায়িক গণজাগরণমূলক লোকসঙ্গীত।
(গ) স্বদেশ প্রেমিকদের জীবন ও বাণীমূলক লোকসঙ্গীত।
(ঘ) স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানমূলক লোকসঙ্গীত।
ঙ) স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অবস্থামূলক লোকসংগীত।
(চ) বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ আহ্বানমূলক লোকসংগীত।
(ছ) রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষমূলক লোকসংগীত।
৪। বৃক্ষরোপণ মূলক লোকসঙ্গীত।
৫। জন্ম নিয়ন্ত্রণ মূলক লোকসংগীত।

* রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দ দাস ইত্যাদির স্বদেশী গান আমাদের আলোচনায় ব্যবহৃত হয়নি।

১। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ মূলক লোকসঙ্গীত ঃ

দেশে কোন স্থানে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হলে লোককবি সেই বিষয়কে নিয়ে গান রচনা করেন। ক্রমে সেই গান মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে উক্ত অঞ্চলের কামনা বাসনার কথা প্রকাশ করে এবং ভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মনে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে এক বিশেষ চেতনার ও সহমর্মীতার জাগরণ ঘটায়।

হায় মা জননী শোন গো কাহিনী
করি নিবেদন মোরা অভাজন,
ভাসিয়া গিয়াছে মোদের দেশ।
গরু ভেসে গেছে, ভেসেছে ঘর,
কত দেহ ভাসে আত্মীয় পর।
অনাহারে কাঁদি মোরা দেশবাসী,
কোথা সরকার কোথা পরবাসী—
বাঁচাও মোদের বাঁচাও দেশ।
হায় মা জননী ভাসিয়া গিয়াছে মোদের দেশ॥ ১

বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ বিষয়ক গানগুলি সমসাময়িক প্রয়োজনের দিনেই মাত্র গাওয়া হয় অন্য সময় এগুলি গাওয়া হয় না।

২। অস্পৃশ্যতা মূলক লোকসঙ্গীত ঃ

অস্পৃশ্যতা একটি সামাজিক অসুখ। একটি ভয়াবহ অভিশাপ। গান্ধীজী অস্পৃশ্য বঞ্চিত মানুষদের হরিজন আখ্যা দিয়ে আপন করে নিতে চেয়েছিলেন। তারও আগে ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেব সকল শ্রেণীর মানুষকে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই সামাজিক অসুখ দূর করার জন্য লোকসংগীতের মধ্যেও একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়—

মানুষ হয়ে অমানুষ হয়ো না
মানুষকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বলো না।
সব মানুষই ভাই ভাই ও ভাই
হাড়ি মুচিতে ভেদ নাই।
যবন হরিদাস ছিল একজনা—
শ্রীচৈতন্য তারে করল আপনা। ২ ইত্যাদি।

৩। স্বদেশী চেতনামূলক লোকসঙ্গীত ঃ

পরাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশী চেতনার লোকসঙ্গীতগুলি গণজাগরণের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছিল। বিলাতী বস্তু ত্যাগের আহ্বান ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে নিম্ন গানে—

ত্যাজ বিলাতি বসন, বিলাতি ভূষণ
বিলাতি চিনি ও লবণ
কেহ আব কোর না গ্রহণ।
এ যে সকল জাতীব ধর্ম নষ্ট হতেছে এক ভোজনে
এ সকল অজ্ঞাত পাপ ধর্ম বই আর কেউ না জানে।

* * *

মিছিবি ও লবণ চিনি সবই দেও বিসর্জন
একবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরম। ৩

বিদেশী বস্তু বর্জন করে দেশী বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে নিম্নের গানে। বলা বাহুল্য এই সঙ্গীতগুলি পরাধীন ভারতের মানুষের মনে অদ্ভুত সাড়া জাগিয়েছিল।

দেশের জিনিষ আদর করে খাওনা সবাই ভাই
আর বিদেশীতে কাজ কি তোমার ছাড়না বালাই।
দেশে আর কিছু অভাব নাই
এখন যা চাবে তা ঘরেই পাবে ক্রমে ক্রমে সবই হবে
আর দেশের লোকের রুটি মেরে
ভরিও না বিদেশীর পেট। ৪

৩। ক. সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বিরোধী লোকসঙ্গীত ঃ

বৃটিশ সরকার এক সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, কৌশলে ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাতে পারলে, ভারতবাসী আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তখন তাদের পক্ষে বৃটিশ বিরোধিতা সম্ভব হবে না। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে জনজাগরণের কাজ করেছে বহু লোকসঙ্গীত। তারই একটি—

ভায়ে ভায়ে বিসম্বাদে ভেঙ্গনা একতা বল
বিদেশীর যাদু মন্ত্রে কেন রে হোল পাগল।

* * *

তোমার আমার গৃহবাদে দেশটা যাবে রসাতল
তোমার আমার বিবাদ রাখা বিদেশীর এই কলকৌশল। ৫

৩। খ. অসাম্প্রদায়িক গণজাগরণমূলক লোকসঙ্গীত :

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আহ্বান জানান হয়েছিল লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে। এই ভাবে এক শক্তিশালী সংগ্রামও সংগঠিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। গানটি নিম্নরূপ –

জাগরে জাগরে ভারত সন্তান,
হিন্দুমুসলমান হয়ে এক প্রাণ
স্বদেশের হিতে সবে কর আত্মদান। ৬

৩। গ স্বদেশ প্রেমিকদের জীবনবাণী ও লোকসঙ্গীত :

দেশপ্রেমের বিষয় নিয়ে যেমন অজস্র লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে তেমনি স্বদেশ প্রেমিকদের জীবন ও বাণী নিয়েও অনেক লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে। এ জাতীয় সংগীত দ্বারা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার মালিগ্রামে প্রাপ্ত একটি পটুয়া সঙ্গীতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর প্রসঙ্গ এসেছে।

ক্ষুদিরাম জন্ম নিল ৩রা ডিসেম্বর
মেদিনীর ছেলে শহীদ অমর।
ক্ষুদিরাম ভারতের নব ভগীরথ
দিশারী দিয়াছে জাতে স্বাধীনতা পথে।

*   *   *

ক্ষুদিরাম আত্মদানে দেখাইল পথ
শোণিতের বিনিময়ে স্বাধীন ভারত।
বধিতে কিংস ফোর্ডে হয় আগুয়ান
সঙ্গেতে প্রফুল্ল চাকী দুই শক্তিমান। ৭

অন্য একটি পটুয়া সঙ্গীতে মাতঙ্গিনী হাজরার প্রসঙ্গ এসেছে। পটুয়া চিত্রে মাতঙ্গিনীর বীরাঙ্গানা মূর্তিও চিত্রিত হয়েছে যাতে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায়—

মেদিনীর তমলুকে জন্মে মাতঙ্গিনী
আদর্শ মহিলা রত্ন মাতা যশস্বিনী।
ভারতের স্বাধীনতা অবসান তরে,
মাতঙ্গিনী স্মরণীয় আত্মদান করে। ৭ক

মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া থানার মোহনপুর গ্রামে একটি লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত হয়েছে—ঐ লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে গান্ধীজীর বাণী দেশবাসীকে জানানো হয়েছে। লোকসঙ্গীতটি পরাধীন ভারতবর্ষে উক্ত অঞ্চলে গণজাগরণের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল-

শুনরে ভারতবাসী, শুন সবে আসি—
যে আদেশ করেছেন গান্ধী অবতার,
সত্য পথে চল সত্য কথা বল
হবে না বিফল সত্য মূলাধার।
বিলিতি পরিব না বিলিতি কিনিব না আর
ও বুলি বলিব না আর প্রতিজ্ঞা আমার
চরকায় কাট সুতো দুঃখ কর প্রতিকার,
শোন মা লক্ষ্মীগণ তোদের সন্তানের
এই নিবেদন
বিলিতি বর্জন কর এই বার। ৮

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে গান্ধীজীর জয়গান করা হয়েছে। গান্ধীজীর প্রতি অসীম আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে ঐ গানে এবং গানটিতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রসঙ্গও এসেছে—

"নন-কোপারেশন" ইংরেজী শব্দটিও সরাসরি গানের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে—

জয় গান্ধী বল ভাই
আর কোন দুঃখ নাই।
দেশের দুঃখ হবে অবসান
হয়ে সবে এক মন
কর নন-কোপারেশন
দেশের যত হিন্দু মুসলমান। ৯

গান্ধীজী দেশবাসীকে বলেছিলেন বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করে দেশীয় বস্ত্র পরতে। এজন্য তিনি পূর্বের মত চরকায় সুতো কাটার ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করার জন্যও লোকসঙ্গীত প্রচলিত ছিল :

চরকা আমার সোয়ামী পুত
চরকা আমার নাতি,
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতি। ৯

৩। ঘ. **স্বাধীনতা সংগ্রামের আহবান মূলক লোকসঙ্গীত :**

দীর্ঘদিন বৃটিশ শাসনে, অত্যাচারে ভারতবাসী নির্যাতিত হয়েছিল। বহু রক্তের বিনিময়ে এসেছিল স্বাধীনতা। বহুদেশ নেতার আহ্বানে দেশবাসীর মোহমুক্তি ঘটেছিল। বহু পল্লী-চারণ কবির গলায় ছিল স্বাধীনতার জন্য জন-জাগরণের লোকসঙ্গীত। সেই সঙ্গীত গ্রামের পর গ্রাম মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উত্তেজিত করেছিল। নিম্নোধৃত গানটিতে গান্ধীজীর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" কিংবা "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"-এর অনুরণন আছে।

বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও
তোমরা এখন ঘুমাও
কতযুগ গেছে কেটে, দেখছ কত স্বপন
বদর বলে ধর বৈঠা জীবন মরণ পণ। ১০

৩। ঙ. **স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অবস্থা মূলক লোকসঙ্গীত :**

বহু রক্ত ক্ষয়ে স্বাধীনতা এল এক সময়। কিন্তু জনগণের কাছে সে, স্বাধীনতা সুখ নিয়ে আসতে পারেনি। নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, ডিভোর্স, দারিদ্র্যের বিসদৃশ প্রসাধন প্রমত্ততা, স্ত্রী-উচ্ছৃঙ্খলতা। মেদিনীপুর জেলার নয়া গ্রামে প্রাপ্ত পটুয়া সঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে—

১৯৪৭ সালে পেলাম স্বাধীনতা
ভেবেছিলাম সুখে দিন কাটবে
ঘুচবে মনের ব্যথা।
কিন্তু হায় মনের ব্যথা বলতে হেথা
প্রাণটা কেঁদে ওঠে
স্বাধীন ভারত আসার পরে কণ্টেল এল ছুটে।
(কণ্টেল—কণ্ট্রোল)
তাই হায় ঘরে ঘরে ভাত কাপড়ের তরে পড়ল হাহাকার
ফুট (ফুড) কুমেটির (কমিটির) মেম্বার বাবুর পায়ে নমস্কার। ১১

স্বাধীন ভারতে কাপড়ের কণ্ট্রোল হয়েছিল। এখনও আছে চাল আর চিনির কণ্ট্রোল প্রথা। পয়সা দিয়েও সব সময় প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়া যায় না। তাই ফুড কমিটির মেম্বারকে ঘন ঘন সেলাম দিতে হয় প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়ার জন্য। এই অবস্থা কিন্তু জনগণের অনভিপ্রেত।

৩। চ. **বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ আহ্বান মূলক লোকসঙ্গীত :**

১৯৬২ সালে চীন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। পল্লীর চারণ গায়ক পথে পথে গান গেয়ে দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটাতো। গানগুলির মধ্যে বিদেশী শাসনের নগ্ন বর্বরতার দিক এবং পরাধীনতার জ্বালার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আহ্বান জানানো হয়েছে বিদেশী হানাদার শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য—

শোন শোন মা ভাই বোন বন্ধুগণ
চীন করেছে ভারত আক্রমণ।
মোদের স্বাধীনতা যাবে এবার--
চ্যাপ্টানাকা শাসন করবে এবার—
গোরা বাঁদরের মত সবার
ঘর বাড়ী করবে ছারখার।
শুন গো বাঙালী সন্তান,
ধর গো বন্দুক কামান—
ভয় ভুলে সবে শক্ত কর মন
চীন করেছে ভারত আক্রমণ। ১২

৩। ছ. **রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ মূলক লোকসঙ্গীত :**

এক সময় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিশদফা কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল। উক্ত বিশদফা কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের সর্বাত্মক বিকাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। পটুয়া সংগীতে উক্ত কর্মসূচীর সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—

বিশদফা কর্মসূচী সরকার করিল ঘোষণা
অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির দাম ক্রমেতে কমিবে
উৎপাদন সংগ্রহ বণ্টন সুষ্ঠুতর হবে।

কৃষি জমির উর্দ্ধসীমা করি নির্দ্ধারণ
ভূমিহীনে জমি দিবে করিয়া বণ্টন।
বাস্তু হীনে ঘর দিয়া ঘর দিবে গাঁড়।
বেগার আর দাশ প্রথা যাবে গড়াগড়ি। ১৩

নিচের লোকসঙ্গীতে সি. পি. আই. কে বিদ্রূপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে একদা সে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে ভোট প্রার্থী ছিল (ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে) বর্তমানে সে আছে সি. পি. এম. প্রভাবিত বামফ্রণ্টের ছত্রছায়ায়—

শুনলে মোদের হাসি পায়
সি. পি আই. যে ভোট চায়।
এক দিন ও যে ছিল কংগ্রেসের লেজুড
কংগ্রেস যেদিন ফেলে দিল
সে দিন সুড় সুড়
ধরল কসে সি. পি. এম. এর পায়। ১৪

সি. পি. এম. পার্টির প্রতীক কাস্তে হাতুড়ী। লোকসঙ্গীতে ঐ প্রতীক ও দলের গুণগান করা হয়েছে জন জাগরণের জন্য।

ও ভাই সর্বহারা
প্রতীক মোদের কাস্তে হাতুড়ী তারা।

কিংবা অন্য একটি টুসু গানে (দৈনিক বসুমতী ২৩।৩।১৯৮৭---২য় পৃষ্ঠা) কংগ্রেস দলকে নিয়ে নানাভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কংগ্রেস দলের প্রতীক কাটা হাত, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, গণিখান চৌধুরী ইত্যাদি প্রসঙ্গও আছে। সিদ্ধার্থ শংকর রায় হয়েছেন সিধু খুড়া। গানটি নিম্নরূপ—

কাটা হাতের বিকট চেহারা।
আবার হবিরে গোহারা ॥
লক্ষ লক্ষ টাকা গুণ্যে
রাজীববাবুর পাহারা।
জনগণের রক্ত চুষ্যে
উড়াস টাকার ফোয়ারা ॥

গণি চাচার দপ্তর নাই
মন্ত্রীটি কেমন পারা।
রেলের কাজে ফেল করো
তাই চষো সাহারা॥

*　　*　　*

সিধু খুড়ার কাণ্ড দেখো
হাঁসিটা যায় না ধরা॥

*　　*　　*

তোদের শিক্ষা দিবার তরে
সামনে আছে কাহারা।
যাদের হাতে র'য়েছো ভাই
কাস্তে হাতুড়ি তারা॥

(বাঁকুড়া দর্শন, বাঁকুড়া)।

৪। বৃক্ষরোপণ ও লোকসঙ্গীত :

বৃক্ষ রোপণ ও বনভূমি সৃজনের চেষ্টা এখন ব্যাপক ভাবে হচ্ছে। তাই সরকারী চেষ্টায় "সমাজভিত্তিক বনভূমি" সৃজনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক লোকসঙ্গীতও লোকসমাজে প্রচলিত রয়েছে -

একটি গাছ একটি প্রাণ
এই তো হোল সরকারী বিধান।
গাছ লাগাও গাছ লাগাও সবে
নইলে বৃষ্টি বন্ধ হবে।
থাকবে নাকো সৃষ্টি ধরা
যখন তখন হবে খরা।
রক্ষা করো গাছের জান
একটি গাছ একটি প্রাণ। ১৫

৫। জন্ম নিয়ন্ত্রণমূলক লোকসঙ্গীত :

মানুষের জন্মহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার জনকল্যাণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত না হলে জন বিস্ফোরণে একদিন পৃথিবীতে

মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর সংকুলান হবে না। পৃথিবী মনুষ্য বাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। সরকার প্রচারিত "জন্ম নিয়ন্ত্রণ" বিষয়কে নিয়েও বহু লোকসঙ্গীত জনসমাজে প্রচলিত আছে। এই সঙ্গীতগুলি জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়ক। বলা বাহুল্য বৃক্ষ রোপণ, কিংবা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক লোকসঙ্গীতগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই রচিত।

বাবু গো সরকার করেছে
পরিবার পরিকল্পনা।
হিসেব করে ছেলে হবে, বেশী হলে চলবে না।
ওগো বিবি ভাবী যদি ভাল খাবি—
থাকবি সুখে সিনেমা যাবি—
বেশী ছেলেমেয়ের ঝামেলা তবে করিস না।
শোন গো লেড়কা লেড়কী গিন্নী বান্নি
আর ঘরের জেনানা
সরকার করেছে পরিবার পরিকল্পনা। ১৬

এই গানটিতে হিন্দী শব্দও কিছু ঢুকে পড়েছে আধুনিকতার প্রভাবে। গানটিতে ঐহিক সুখের প্রতিও লোভ দেখান হয়েছে যাতে মানুষ সচেতন হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অন্য একটি পটুয়া সংগীত –

বেশী সন্তান দুঃখের জ্বালা দম্পতি অসহায়
দুই সন্তান সুখী পরিবার পিতামাতা তাই চায়।
পরিবার পরিকল্পনার নীতি
যুগ পরিবেশে গ্রহণীয় রীতি।
দুটির পর আর একটিও নয়।
আর হলে হবে দায়
বেশী সন্তান দুঃখের জ্বালা
দম্পতি অসহায়। ১৭

উক্ত সঙ্গীতটি পট দেখিয়ে হরেন্দ্র চিত্রকর জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। পটের ছবিগুলিও বেশ জীবন্ত।

উল্লেখপঞ্জী

১. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৭৯—(বন্যা—১৯৭৮) বর্ণনাকারী গোপাল দাস, তপন জানা, ভগবানপুর, মেদিনীপুর।

২. নিজস্ব সংগ্রহ ১৯৮৫—কেদার মেলা—ডেবরা- ছট. দাস।
৩. পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ- পৃঃ ৩৩৬—৩৩৭।
স্বদেশী গান গীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৭।
৪. বীণা ঝঙ্কার—সম্পাদক—অমৃতলাল বসু, পৃঃ ১১৮।
স্বদেশী গান—গীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৯।
৫. স্বদেশী গীতি-প্রকাশক—হরেন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৬-১৭, গান-১৫
স্বদেশী গান গীতা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫১।
৬. মাতৃপূজা প্রকাশক—হ. বসু, গান ২১, পৃঃ ২২-২৩।
৭. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮০, বর্ণনাকারী হরেন্দ্র চিত্রকর—মালিগ্রাম মেদিনীপুর।
৭ক. নিজস্ব সংগ্রহ, ঐ
৮. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮১, বর্ণনাকারী সত্যবতী ঘড়া--মোহনপুর, মেদিনীপুর।
৯. লোকসঙ্গীত সমীক্ষা—বাংলা ও আসাম--হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পৃঃ ১৩৫।
১০. চিত্তরঞ্জন দেব
বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ—হাবিবুর রহমান—পৃঃ ৯৮।
১১ নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮০—বর্ণনাকারী নরেন্দ্র চিত্রকর—নয়া।
১২. নিজস্ব সংগ্রহ —১৯৮২—বর্ণনাকারা —বাসুদেব মাইতি, মোহনপুর, মেদিনীপুর।
১৩. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮০—বর্ণনাকারী—হরেন্দ্র চিত্রকর, মালিগ্রাম মেদিনীপুর।
১৪. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৬, বর্ণনাকারী—গৌরাঙ্গ জানা—রঘুনাথ-বাড়ী, মেদিনীপুর।
১৫. নিজস্ব সংগ্রহ—বৃক্ষরোপণ উৎসবে গীত হয়েছিল—সবং, মেদিনীপুর।
১৬. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮৫—জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রচারমূলক সভায় গীত হয়েছিল— কদমডিহা, মেদিনীপুর।
১৭. নিজস্ব সংগ্রহ—১৯৮০, বর্ণনাকারী—হরেন্দ্র চিত্রকর, মালিগ্রাম, মেদিনীপুর।

অষ্টম অধ্যায়

লোকসঙ্গীতে উপমা ও চিত্রকল্প

লিখিত সাহিত্যের লেখকগণ অসাধারণ দক্ষতায় পরিশীলিত মননের ছোঁয়া দিয়ে তাঁদের রচনার মধ্যে সার্থক উপমা, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প ইত্যাদির প্রয়োগ করে থাকেন। ঐ সব ক্ষেত্রে লেখকের নিজস্ব চেতনা কল্পনার শীর্ষস্থান বেয়ে সাহিত্যের আসরে নেমে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনা আশ্চর্য প্রসাদ গুণে ভরা হয়। বাণীভঙ্গিমা লেখকের স্বাতন্ত্রকে চিহ্নিত করে। লোক-সাহিত্যেও উপমা প্রয়োগ, প্রতীক ব্যবহার, চিত্রকল্প, নির্মাণের ক্ষেত্রে লোক-কবিরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। লোকসাহিত্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 'উত্তুঙ্গ' কল্পনা'র বিহার হয়তো পাব না কিন্তু যেটুকু পাওয়া গেছে তাও নেহাত কম নয়। লোককবিগণ প্রাত্যহিক জীবন থেকেই 'ব্যবহার-দীর্ণ' উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন। কোনরকম কৃত্রিমতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। "মুখে খৈ ফোটান" একটি লোকপ্রবাদ। ননদিনীর বাচন ভঙ্গিমা প্রকাশ করতে গিয়ে লোক-কবি গাইলেন "ননদিনীর মুখের চোটে ধান্য দিলে খৈ ফুটে।" কিংবা বৈকালিক প্রসাধন সেরে চলে যাওয়া লোক নায়িকার বেণী দেখে লোক-কবি যখন গেয়ে ওঠেন —"ঝুলছে বেণী ভুজঙ্গিনী" তখন কিন্তু লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের উপমা প্রয়োগ, চিত্রকল্প রচনার দক্ষতার মধ্যে যে পার্থক্য তা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখব লোকসঙ্গীতের মধ্যে লোক-কবি কিভাবে উপমা, প্রতীক, চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে উপমা প্রয়োগের। শ্রেষ্ঠত্ব অর্থে লোক-কবি নিজের অজান্তেই গূঢ় ব্যতিরেক অলংকার প্রয়োগ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ অর্থে—গূঢ় ব্যতিরেক অলংকার :

প্রিয় বস্তুর উৎকর্ষ বোঝাতে লোক-কবি মাঝে মাঝে অপূর্ব সমস্ত উপমা ব্যবহার করেছেন। নারীর চুলের বর্ণনায় লোক-কবি বসন্ত-প্রিয়

কোকিলের কালো রঙটি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট নন। তার থেকে উপমেয়ের উৎকর্ষ যেন অনেক বেশী —পূর্ববাংলার একটি লোকসংগীতে—

কালোত্ কালে হে
কালোত্ কুকিলা
ফেইচকায় বা ধরে নানান ভ্যাস
তাহার চাইতে অদিক কইন্যা
তোমার মাতার ক্যাশ। ৩
(উচ্চারণ বিকৃতিতে 'মাথা' হয়েছে—'মাতা')

অন্য একটি লোকসংগীতে নারীর চুলের কালো রঙ-এর উৎকর্ষ বোঝাতে কাক আর কোকিলের প্রসংগ এনেছেন লোককবি —কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে উপমান অপেক্ষা -উপমেয় চুলের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করা হয়েছে--

কাক কালো কোকিল কালো
আর কালো ম্যাঘরে
তারো চ্যায়া অদীন কালো রে কন্যা
তোমার মাথার ক্যাশ। ১

নারীর হাতের শাঁখা পবিত্রতা ও শুভ্রতায় উজ্জ্বল। তাকে প্রকাশ করতে লোক-কবি বকের শুভ্রতা আর আকাশে ভাসমান শরতের শুভ্র মেঘের প্রসংগ এনেছেন--

বগ ধলা, বগিলা ধলা আরো ধলা ম্যাঘ
তারো চাইয়া অদীন ধলা রে কন্যা
তোমার হাতের স্যাঁকা। ২

লাল রঙ সে তো মধু মাসের রঙ—তা যেন অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার হৃদয়ের নির্যাস। তবু লোককবি তাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁর কাছে লোকপ্রিয়ার সিঁথির সিঁদুর বিন্দুই শ্রেয়—

নালো তো নালো রে
নালোত্ ওড়ো ফুল
তাহার চাইতে অদিক নালো কইন্যা
তোমার 'শীথার' সেন্দুর। ৩

সাদা রঙের বর্ণনা প্রসঙ্গে—উপমানকে গ্রহণ করা হয়েছে গৃহপালিত গাই-এর দুধ থেকে। গাই-এর দুধ সাদা—কিন্তু লোকপ্রিয়ার চাঁদ মুখের শুভ্রতার কাছে আর কেউ দাঁড়াতে পারে না।

ধলোত্ ধলো রে
কইন্যা ধলোত গাই-এর দুদ
তাহার চাইতে অদিক ধলো কইন্যা
তোমার চন্দ্রমুক। ৩ক

উক্ত লোকসঙ্গীতে 'বিষয়ী' হোল 'গাইয়ের দুধ' এবং উপমেয় হয়েছে কন্যার—'চন্দ্রমুক'—মুখকে চাঁদের শুভ্রতার সঙ্গে তুলনা করে কন্যার পবিত্রতার দিকটিও পরিস্ফুট করা হয়েছে। কন্যার রূপ-লাবণ্যও চাঁদের জ্যোৎস্নার উৎকর্ষে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

উক্ত বর্ণনাগুলিতে উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে অধিক উৎকৃষ্ট রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলিকে গূঢ় ব্যতিরেক অলংকার বলেই ধরা যেতে পারে।

প্রতীক ঃ

লোকসঙ্গীতে মামী এবং ভাগনার সম্পর্ক প্রায়শঃই অবৈধরূপে দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শালীনতা বোধকেও অতিক্রম করে গেছে। সম্ভবতঃ রাধা ও কৃষ্ণ বিষয়ক পরকীয়া তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত লৌকিক চেতনায় মামী ও ভাগনাকে অবৈধ পথে সঞ্চালিত করেছে। বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি ভাওয়াইয়া গানে ভাগনা ও মামীর কথোপকথন ধরা পড়েছে। ভাগনা তার মামীকে প্রশ্ন করেছে—

বুক্কের ওপোর কি গো মামী
বুক্কের ওপোর কি ?
তোমার মামা কইরবে খেলা
নাটিম (লাটিম) কুন্দেছি। ৪

উক্ত গানে স্তন লাটিমের প্রতীকে ধরা পড়েছে। ঐ একই গানে স্তন যুগল 'লাউ'-এর প্রতীকে ধরা পড়েছে।

না চাই তোমার খই মামী
না চাই টেঙ্গা দই।
বুকের উপর লাউ ধরিচে
তাকে পাইলে নই।

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে স্তন হয়ে উঠেছে ডালিমের প্রতীক। গানটিতে কামার্ত রমণীর বেদনাও প্রকাশিত হয়েছে। গাছের ডালিম রোগীতে খায়, কিন্তু উক্ত রমণীর ডালিম ব্যর্থ হচ্ছে।

গাছের ডালিম যেম্যান ভাইরে
উগি (রোগী) গুলায় খায়
মোর নারীর চাংগর ডালিম
গড়াগড়ি যায় রে। ৫

একটি লোকসঙ্গীতে যৌবনবতী নারীদেহ "কলা"র প্রতীকে ধরা পড়েছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যাবে এক সিপাই নিজ কাজে দূরদেশে চলে যাচ্ছে। গৃহে ফেলে যাচ্ছে যুবতী স্ত্রী। স্ত্রীর আশঙ্কা—বাদুড় এসে কলা খেয়ে যাবে, পড়ে থাকবে খোসা। এখানে 'বগদুল'—অর্থাৎ বাদুড় কপট প্রেমিকের প্রতীকে ধরা পড়েছে।

তুমি যাইবে দূরে দ্যাশে
আমারে ছাড়িয়া,
তোমার কলা বগদুলে খাবে
চোচা (খোসা) পাবে আসিয়া রে।
কদ্দিনে আসিবেন মোর সিপাই রে। ৬

একটি ভাওয়াইয়া গানে বাদুড় কপট প্রেমিক বা গুপ্ত প্রেমিকের প্রতীক। এবং যুবতী নারী বাগানের লোভনীয় ফলের প্রতীকে ধরা পড়েছে। 'কালা' যেন প্রকৃত বা স্বীকৃত প্রেমিকের প্রতীক।

ওকি কালারে কালা
বাদুরেরো হুড়াহুড়ি
মুইয়ো হনু যুব্বা নারী রে
ওকি কালারে
আইসেন কালা সেই বাদুর মারিতে। ৭

সঙ্গীতে 'সাগর' ব্যর্থতার বা হতাশার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সাগর নামটি শুনতে ভাল। তার বিদ্রোহী রূপ মন মাতায়। কিন্তু সাগরে ভেসে যাওয়া! সে তো মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করা। নিচের গানটিতে এক যুবক কথা দিয়েও প্রেমিকাকে ফাঁকি দিয়েছে। এখানে আশা, হতাশার সাগরে ভেসে গেছে। লোককবির চিত্রকল্পটি সুদক্ষ সারল্যে মণ্ডিত ঃ

আইসো চ্যাংড়া বইসো কাচে
তোর সনে মোর কথা আচে
আশা দিয়ে ওরে চ্যাংড়া
ভাসাইলে সাগোরে। ৮

যৌবন :

মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। যৌবনের স্থায়ীত্ব ও স্বল্প। এই দুটি বস্তুকে চিরস্থায়ী করা হয়তো কোন দিনই সম্ভব হবে না। লোভনীয় এই যৌবনের ক্ষণিকতা প্রকাশ পেয়েছে একটি সুন্দর উপমাতে –

সাঁজের ফুটা ঝিঙা ফুল, সকালে মলিন
যৌবনের গরব কতদিন। ৯

সন্ধ্যার অন্ধকারে বিকশিত ঝিঙা ফুল প্রভাতের আলোর ছোঁয়ায় যেমন মলিন হয়ে যায় ক্ষণকালের মধ্যেই, তেমনি যৌবনের অহংকারও চূর্ণ হয়ে যায় প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়ায়।

একটি আলকাপ গানে যৌবনকে ফুল কলির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যৌবন ক্ষণস্থায়ী, ফুল কলিও ক্ষণজীবী। যৌবনে মধুলোভী ভ্রমরের মত প্রেমিকেরাও ভীড় জমায়—কিন্তু যৌবন চলে গেলে সকলেই নিঃসঙ্গতা অনুভব করে।

যৌবন প্রভাবে কতদিন যাবে
কলি শুকালে অলি ফিরে চাইবে না।

যৌবন না থাকলে প্রেম শিথিল হয়ে যেতে যেতে এক সময় থেমে যায়। মধু ছাড়াও ভ্রমর আসে না। ডাল ভেঙে যেখানে ফুল শুকিয়ে যায় এবং যেখানে যৌবন থাকে না উভয় স্থানেই প্রেমিকরূপী ভ্রমর থাকে না—লোককবি অসাধারণভাবে চিত্রকল্পটি চিত্রিত করেছেন। একটি খেমটি গানে এই চিত্রটি লক্ষ্য করা যাচ্ছে—

মধু ছাড়া ভ্রমর কোথাও রয় না
আজ ডাল ভেঙে ফুল শুকাই গেল
ভ্রমর আর তো ফিরে চায় না। ১১

সোনা চিরদিন মূল্যবান। মানব জীবনে ক্ষণস্থায়ী যৌবনও তেমনি মূল্যবান। লোক-নায়িকা তাই লোকসঙ্গীতে যৌবনকে সোনার সঙ্গে তুলনা করেছেন—

আমার বাড়ী যাইয়ো পাননাত (প্রাণনাথ)
খাইয়ো বাটার পান
এ হ্যান সোনার যৈবোন
তোমায় কইরবো দান রে। ১২

কোন কোন সময়ে লোকসঙ্গীতে যৌবনকে বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। একটি লোকসঙ্গীতে যৌবনকে শিমুল কাঁটার মত ধারালো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। লোককবি গ্রামের মধ্য থেকে, প্রকৃতির মধ্য থেকে, প্রাত্যহিক জীবন থেকেই এ সমস্ত উপমাগুলি সংগ্রহ করেছেন :

যৈবোন হইলো
শিমলা (শিমুল) কাঁটার মোত।

প্রেম :

রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে বলেছেন—"অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা"। এই প্রেম যখন আসে তখন বন্যার মতই সে জাতিকুল ভাসিয়ে একাকার করে দেয়। তখন কোন বিচার থাকে না- কোন হিসেবী পথ চলা থাকে না তাই প্রেমকে বন্যার "তুফান" এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-

পীরিতি তোফান বানে
তোমরা জেনে শুনে নামিবি জলেতে।

শিমুল ফুলের আরক্ত লালিমা-প্রেমকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি লোকসঙ্গীতে উপমান হয়েছে বন্ধুর "পীরিত"—উপমেয় হয়েছে—শিমুল ফুল :

ফুলের মইদে শিমলার ফুল
ডগ্‌মগ্ ডগ্‌মগ্ করে
অই মোতোন বনদুর পীরিত
উজান ধরিয়া চলে রে।

প্রেমকে চাঁদের মালা রূপেও কল্পনা করা হয়েছে একটি খেমটি গানে :

যমুনাতে জলকে গিয়ে হোল দেখা শুনা
পীরিতি চাঁদের মালা পরিব দু'জনে বঁধু
আমায় ভুলো না।

নারীর কাছে অলংকার ভীষণ প্রিয়। প্রেমিককে প্রিয় বস্তু রূপে

ভাবতে সকলেরই ভাল লাগে। একটি লোকসঙ্গীতে প্রেমিককে কানের অলংকারের সঙ্গে তুলনা করেছে একটি নারী ঃ

আমি তোমায় ভালবাসি অন্তরে অন্তরে বঁধু
কানে দুটি যেন মাকড়ি।

একটি বুনোকুলের নাম শিয়াকুল। তার কাঁটা অতীব যন্ত্রণাদায়ক। সেই যন্ত্রণাকে তুলনা করা হয়েছে—প্রেম পরিত্যাগ করার যন্ত্রণার সঙ্গে। দুটি যন্ত্রণাই তীব্র। লোকপ্রেমিক স্থির করেছে প্রেমের জন্য সে প্রয়োজনে জাতি ত্যাগ করবে কিন্তু প্রেমত্যাগী হবে না।

শিয়াকুলের কাঁটা যেন বিঁধিল হিয়ায়
বরং জাতি ছাড়া যায়, পীরিতি ছাড়া দায়।

একটি ঝুমুর গানে প্রেমকে মধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সই-এর চঞ্চল ভাব দেখে অন্য সই প্রশ্ন করেছে সঙ্গীতের মাধ্যমে –

আজ কেন সই হলি উতলা
তোরে কে দিল ফুলের মালা
প্রেমের মধু দিল, বঁধু তাই কি এত চঞ্চলা।

কখনও প্রেমকে কাঁচা সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

ও না লিব পীরিতি রতন-কাঁচা সোনা।

লোকসঙ্গীতে প্রেম কখনও ফাঁদের সঙ্গে উপমিত হয়েছে ঃ

কার প্রেম-ফাঁদে পাখী ধরা গেল
নাগর কোঁ এলো।

'লহরী' শব্দটির অর্থ যদিও ঢেউ তবু লোকসঙ্গীতে আবেগের প্রাধান্যে 'লহরী' তার আক্ষরিক অর্থ থেকে সরে এসে ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়—এই লোকসঙ্গীতে প্রেমকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ঃ

প্রেমেরি আগুন উঠিছে লহরী
আমি পড়েছি বিষম ফাঁদে
বলিনা লোক লাজে।

কিংবা অন্য একটি লোকসঙ্গীতও প্রেমকে জ্বলন্ত আগুনের দাহিকা শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

কাঁচা বাঁশে লাগিল ঘুন
পীরিতি করা জ্বলন্ত আগুন।

ভরা নদী। ভরা নৌকা। তাতে ঢেউ লাগলে নৌকার সমূহ বিপদ। কন্যাটির মনও প্রেম সাগরে টালমাটাল—

মাগো আ৽ার মন কেমন করে
যেমন ভ৽া নৌকায় ঢেউ মারে। ১৮

বিরহ :

তুষের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে। তার দাহিকা শক্তি কম নয়। তেমন বিরহের অনলও ধীরে ধীরে সমস্ত হৃদয় মন পুড়িয়ে ছাবখার করে

দারুণ বিরহ জ্বালে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
তুষের অনল যেমন জ্বলে ধিকি ধিকি।

মিলনে যে প্রেম, অমৃত দান করে, বিরহেও সেই প্রেম দান করে গরল। তখন অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় জর্জরিত। ফুলশয্যা তখন কাঁটার বাসর হয়ে জেগে ওঠে। পুরুলিয়ার একটি ঝুমুর গানে দেখি

অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী নিল দুকুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে মম কুল রে।

খাঁচায় আবদ্ধ পাখী যখন দূর বনাঞ্চলের আহ্বান পায় তখন খাঁচার বাইরে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠে, তেমনি রাধাও কৃষ্ণের আহ্বানে লোকসমাজের খাঁচার মধ্যে আকুল হয়ে ওঠে—

তবে বংশীতে যখন করতে গান ছটপট করে প্রাণ
যেন পিঞ্জরায় ধরা পাখী।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বজন বিদিত। রাধা পরকীয়া প্রেমে কৃষ্ণের সঙ্গে আবদ্ধ। সে আক্ষেপ করে জানায় তার কুলরূপ কলসীকে, কৃষ্ণ কলঙ্ক রূপ সাগরে নিমজ্জিত করেছে। এখানে কুল এবং কলঙ্ক উপমেয়। কলসী এবং 'সায়র' উপমান হয়েছে—

কালশশী বাজায় বাঁশি কাঁদি নিরলে বসি
ডুবালো আমার কুল কলসী কলঙ্ক সায়রে গো।

উক্ত লোকসঙ্গীতটি বেলপাহাড়ী অঞ্চলে পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকে বলা হয়েছে 'কাল শশী'—চাঁদ রূপালি—সে কালো হয় না তবু বোধহয় সোহাগ ভরে বলতে গিয়ে এবং অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়োজনে 'কালশশী' শব্দটি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি নিয়ে উপস্থিত।

চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রায়ই প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি থাকে। তখন চাতক পাখীর অবস্থা করুণ। লোকশ্রুতি আছে—চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্য জল গ্রহণ করে না। খরার সময়ে চাতক থাকে জীবনমৃত। তার সেই অসহনীয় অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে প্রিয়াহীন প্রিয়ের তীব্র বিরহের যন্ত্রণার সঙ্গে -

চৈতচাতকী বৈশাখে খরা
পিয়া বিনা, বন্ধু জীয়ন্তে মরা।

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে বিরহের তীব্রতা, অসহায়তা প্রকাশ করতে চাতকের প্রসঙ্গ এসেছে।

জল বিনে কত চাতক পাখী
বন্ধু বিনে কেমনে থাকি।

বিচ্ছেদ বিরহের একটি অসাধারণ চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে নিচের লোক-সঙ্গীতে—

সোনার বঁধু যায় চলিয়া
বুকেতে যেন ঢেঁকির প্রহার পড়ে গো।

লোকজীবনে একদা ঢেঁকির ব্যবহার খুবই ছিল। ঢেঁকির আঘাত বেশ জোরালো- -এই লোকজ্ঞানকে উপমা হিসেবে লোককবি লোকসঙ্গীতে ব্যবহার করেছেন।

বিরহের যন্ত্রণাকে কখনও সাপ কামড়ানোর যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

দংশে বিরহ ভুজঙ্গিনী।

বিরহ যন্ত্রণার একটি ছবি অসাধারণ চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে রংপুরের ভাওয়াইয়া গানে—

নলের আগুন তলে তলে
খাগড়ার আগুন জ্বলে।
মোর নারীর মনের আগুন
বাইরে ভেতোরে জ্বলেরে।

এখানে উপমান হোল 'নলের আগুন' খাগড়ার আগুন কিন্তু তা অপেক্ষা উপমেয় নারীর মনের আগুনের উৎকর্ষ'তা প্রতীয়মান হওয়ায় এটি গূঢ় ব্যাতিরেক অলংকারের পর্যায়ভুক্ত।

আঞ্চলিক উপমা

লিখিত সাহিত্যের মত লোকসঙ্গীতেও লোককবি অদ্ভুত ভাষায় কারুকার্য দেখিয়েছেন। ব্যবহৃত জীবন থেকে নেওয়া সাধারণ শব্দগুলি অসাধারণ ব্যঞ্জনার প্রতীকে প্রকাশিত হয়েছে। একটি ঝুমটি গানে নারী বলেছে

হাতে ছড়ি উড়ছে ঘড়ি
আমার শাক, চিলে চুযা মারে
ঐ বিদেশী বন্ধু যারা
ভাব করে না জানি তারা প্রেম করে।

(বর্ণনাকারী—গুরুপদ লোহার (৩০)
ভেদুয়া, মেদিনীপুর, সংগ্রহ ১০। ১১।
১৯৮৬)

উল্লিখিত লোকসঙ্গীতে নারীর কোমল হৃদয়, কোমল শাকের প্রতীকে প্রকাশিত। আবার ধূর্ত প্রেমিক হয়েছে চিলের প্রতীক। ভাব করা আর প্রেম (কপট প্রেম) করা শব্দ দুটির পৃথক অর্থ লোকজীবনকে সচেতন করে তোলে বিদেশী বন্ধুদের ছলনা সম্বন্ধে।

মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়, রাওতোড়া, খাঁদিবাঁধ, ভেদুয়া, ধরমপুর ও তিলাবণী ইত্যাদি অঞ্চল বনভূমি পরিপূর্ণ। প্রকৃতির আদিম সরলতা এখানকার লোকজীবনকে ছুঁয়ে গেছে। লোকসঙ্গীতে হৃদয়ের সেই অনাবিল দিকটিও লভ্য।

এছাড়া শাল, মহুয়া ও ইউক্যালিপটাস ছেয়ে আছে চারদিক। বর্ষাকালে নাম না জানা বুনো লতা অজস্র জন্মে। এই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতে তাই উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রভাব পড়েছে। উল্লিখিত অঞ্চলের পাতা নাচের একটি গানে দেখা যাচ্ছে--

পরের পরাণ বন্ধু কেন এলে এখানে
তার প্রাণে বিচ্ছেদ হবে
সে মরিবে পরাণে।

উল্লিখিত অংশে অরণ্যের আদিম স্বাভাবিকতা ও সহজ বিকাশ লক্ষণীয়। প্রত্যুত্তরে নারী বলেছে—

তুমি তরু আমি লতা
বন্ধু তোমায় ছেড়ে যাব কোথা।

কাছে থাকা অরণ্যের তরু হয়েছে প্রেমিক পুরুষ। আর তাকে অবলম্বন করে লতিয়ে ওঠা বুনো লতা সে তো প্রেমিকা রূপে ধরা পড়েছে। উত্তরে পুরুষ কণ্ঠ বলেছে—

যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে

প্রত্যুত্তরে নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

অসুবে যে গুমবে মরি, তোমার কথায় এখানে।

প্রেম প্রচণ্ড গতিময়। জোর করে তাকে বাঁধাও যায় না। লোক-সঙ্গীতে আঞ্চলিক উপমায় বক্তব্যটি অসাধারণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে –

পীরিতের ডিজিল গাড়ী
চলে এলো গো তাড়াতাড়ি।
মাল দেখে ড্রাইভারের মন মানে না
ডিজেল গাড়ীর ব্রেক ধরে না।*

* নিজস্ব সংগ্রহ—বর্ণনাকারী—অজয় মাহাতো (৩০) ৯।১১।১৯৮৬

তখনও অরণ্যের বুক চিরে গতিময় ইলেকট্রিক ট্রেন চলেনি। লোক-জীবন বিস্ময়ে দূর থেকে তাকিয়ে দেখেছে তৎকালের ডিজিল গাড়ীকে। সেটাই তার কাছে প্রচণ্ড গতিময় মনে হয়েছে। লোকজীবনের অপ্রতিহত প্রেমকে তাই ডিজিল গাড়ীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। লোক শব্দ "মাল" হয়েছে প্রেমিকার প্রতীক। ইংরেজী শব্দ "ড্রাইভার" হয়েছে প্রেমিকের প্রতীক। বাঁধন হারা কথাটি বোঝাতে ইংরেজী শব্দ "ব্রেক ধরে না" এই চিত্রকল্প এঁকেছেন কবি। লোকসঙ্গীতটিতে ইংরেজী শব্দ প্রবেশের নমুনা পাওয়া যাচ্ছে।

রাজেন গোয়ালতোড় অঞ্চলের এক বিখ্যাত গায়ক। তার ব্যক্তিগত চেতনা সার্বিক চেতনায় মণ্ডিত হয়েছে। তার গানে অসাধারণ লোক-চিত্রকল্পের নমুনা পাওয়া যায়। প্রেম থাকে হৃদয়ে—হৃদয় পদ্মে। মধু থাকে পদ্মে। মধু লোভী ভ্রমর চায় হৃদয় পদ্মে মধুপান করতে। পদ্ম কখনও হয় স্তনের প্রতীক, কখনও হৃদয় পদ্মের—

তোর বুকে কি ফুল ফুটেছে
আমি তুলব বলে যাই কাছে।
পদ্ম জোড়া বুকের উপর
কেমন সুন্দর রয়েছে।

হাত বাড়ালে পায়না নাগাল
বহুদূরে রয়েছে।
পদ্ম দুটি ফুটে যখন
পরাগ কত উড়েছে,
পদ্ম গন্ধ পেয়ে ভ্রমর
দৌড়াদৌড়ি আসিছে।
দুটি পদ্ম তোমার দিদি কেমন সুন্দর সেজেছে।
কানা লোকে দেখতে পায়না
গন্ধ পেয়ে হাসিছে।
পদ্মের মধু দাও গো আমায়
এসো গো আমার কাছে,
রাজেন বলে মধু বিনে
ফুল ফুটে কি লাভ আছে।*

* নিজস্ব সংগ্রহ—বর্ণনাকারী—অজয় মাহাতো (৩০) ৯।৯।১৯৮৬

উত্তেজিত বধূ যখন হাত নেড়ে কথা বলে সেই অবস্থা বোঝাতে একটি আঞ্চলিক উপমা গ্রহণ করা হয়েছে টুসু গানে।

দেখ ল বউ এর হাত লাড়া
নদী ধারের ঝুনঝুনি খাড়া।

ঝুনঝুনি এক বিশেষ ধরণের লতা। বাতাসে তা যেভাবে আন্দোলিত হয় বধূর হাতখানিও সেই ভাবে আন্দোলিত হয়।

সজিনা শাকের সঙ্গে পাকা বেগুন যেমন কোনদিন সুস্বাদু হয় না—বরং অতৃপ্তির দুঃখ বাড়ায়, ব্যবহারিক জীবনের এই চেতনা ধরা পড়েছে টুসু গানে—

তুই দুঃখ দিলি মাঘ ফাগুনে
সন্না* শাগে বুড়া বাইগনে**

ভালবাসার ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে একটি টুসু গানে ভুট্টার খই-এর প্রসঙ্গ এসেছে। ভুট্টা সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকায় হয়। উক্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের বিশেষ খাদ্য ভুট্টার খই। সোনালি এবং সাদায় মেশা এই খই যেমন প্রিয় তেমনি প্রিয় ভালবাসা—

* সন্নাশাগ—সজিনাশাক; (২) ** বাইগনে—বেগুনে।

তরা উড়াই দিলি জনহার খই
ভালবাসা রাখতে পারিলি কই।

সতীনের জ্বালাময়তা বোঝাতে ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ একটি উপমা গ্রহণ করা হয়েছে লোকসঙ্গীতে। চালভাজার সময় যে বালি ব্যবহার করা হয় তা ভীষণ উত্তপ্ত। তাতে হাত দেওয়া যায় না। সতীন যন্ত্রণাও অনুরূপ –

সতীন আমার চালভাজার বালি
আমি না পারজে ১ রা কাঢ়ি।

বিবিধ :

প্রেমিকের সুন্দর মুখকে বেলপাহাড়ী অঞ্চলের একটি গানে ফাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে যেন ব্যাধের মত মুখ ফাঁদ পেতে প্রেমিকা রূপ শিকারটিকে ধরতে চায়

সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে
নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
ব্যাধরূপে কদমের তলে।

পুরুষকে ভ্রমর জাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে একটি ঝুমুর গানে। ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে মধু খায়—কপট প্রেমিক পুরুষও তেমনি যৌবন লোভী—

পুরুষ ভ্রমরা জাতি
উড়িয়ে গেল ভ্রমর কোন ফুলে মজিল গো।

সন্তানকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করার প্রাচীন রীতিটি লোকসঙ্গীতে ধরা পড়েছে—

ওরে গোপাল আমার ঘুমোরে ঘুমোরে সোনা
ঘুমো চাঁদের কোণা।

পতি নারীর কাছে পরম সম্পদ। লোকসঙ্গীতে পতিকে ধনসম্পদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

ওরে পতি ধন
অলপো কতায়
ব্যাজার কল্লেন মোন।

(১) পারজে—সহ্য করতে না পেরে।

বাংলা লোকসঙ্গীতে কালো মেয়ের কদর যথেষ্টই রয়েছে। তুলনাটিও লোকজীবন থেকে নেওয়া :

মাচের মইধে কই মাচ ভালো
নারীর মইধে চেংকোন কালো।

কালো মুখের হাসিও যথেষ্ট মধুর।

কি করে তোর উপে (রূপে) হে কইন্যা
কি করে তোর ক্যাশে
ওহে কইন্যা পাগোল কবিলে মোক
তোর কালো মুখের হাসি রে…।

মাঠে কর্মরত এক কৃষকের জন্য তার স্ত্রী দুঃখ করেছে। রৌদ্রে কাজ করতে করতে তার গৌর বর্ণ—বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তারই সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে গানটিতে

আমার বঁধু হাল বাহে কেঁদ কানালির ধারে
গরা গায়ে খরা লাগে বড দয়া লাগে। ১৫

মুখে খৈ ফোটান—একটি লৌকিক প্রবাদ। এটির মধ্যে যে ছবি আছে তা কম চিত্তাকর্ষক নয়। বধূর সংগে মুখরা ননদিনীর ঝগড়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে লোককবি লৌকিক প্রবাদের ছবিটি এঁকেছেন—

ননদিনীর মুখের চোটে ধান্য দিলে খৈ ফুটে
যখন দ্বন্দ্ব করে কোমর এঁটে যাতনা দেয় কতই না। ১৬

গোয়ালতোড় অঞ্চলের ধরমপুরে প্রচলিত একটি পাতা নাচের গানে গৌরবর্ণা একটি রমণীর বেণীকে ভুজঙ্গিণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

উল্টা পেঁচে বেঁধেছি মাথা
তোরা দেখে যা গো সজনী,
ঝুলছে বেণী ভুজঙ্গিনী
চলে যেমন রায় ধনী।
দেখতে লম্বা ফর্সা চওড়া
গায়েতে গো রঙ খানি। ১৭

রাধিকার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে একটি টুসু গানে পূর্ণিমার চাঁদের স্বপ্নালি আলোর প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে উপমেয় রাধিকা, উপমান—'পূর্ণিমা চাঁদের আলো।

কৃষ্ণ কালো রাধিকা ভালো
যেমন পূর্ণিমা চাঁদের আলো। ১৮

লোকসঙ্গীতের মধ্যে এমন কিছু লোকসঙ্গীত আছে যেখানে লোকজ্ঞান অদ্ভুতভাবে ধরা পড়েছে। নিম্নের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতটির মধ্যে লোক-চেতনার জীবন্ত প্রকাশ তার উপমাগুলি

নাও নষ্ট গোদারীর ঘাটে (নৌকা রাখাব স্থান)
নারী নষ্ট বাপো মাযের ঘরে
পুরুষ নষ্ট শহরে বন্দরে। ১৯

জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাব সচিত্র ফসল উক্ত উপমাগুলি ঐ সঙ্গীতে নারীর দীর্ঘ কেশদাম যেমন তাব গর্ব (উপমেয়) তেমনি উপমান ভ্যারেন্ডা গাছের গর্বও তার দীর্ঘ পাতা। লোককবি প্রকৃতি জগৎ থেকেই এই উপমাটি সংগ্রহ করেছেন—

দেগল ক্যাশে নারীর গৈরোব
হ্যান্ডার গৈরোব পাতে।

লোকসঙ্গীতের উপমাগুলি নিবক্ষর মানুষের চোখে দেখা সাধারণ বস্তুর মধ্য থেকেই এসেছে। আশ্চর্য নিখুঁত ছবিগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। দাম্পত্য জীবনের প্রেমে যদি স্বামীর সন্দেহ ও বৈরীতা আসে, তবে কোন দিনই তা সহজ ও স্বাভাবিক হয় না—যেমন গাছের গোড়া কাটলে তা গাছে জোড়া লাগে না কোনদিনই। তেমনি স্বামী বৈরী হলে প্রেমও জোড়া লাগে না—

গাচের গোড়া কাটিলে য্যামোন
নাহি লাগে জোড়া
সোয়ামী বরি হইলো
পীরিতি না লাগে জোড়া।

লোকসঙ্গীতে এমন কিছু উপমা আছে হয়তো তা চিরন্তন সত্য নয়—তবু এই উপমাগুলিকে একেবারে বাতিলও করে ফেলা যায় না—

বাড়ীর শোবা গাচ-গাচালি
আইগ্নার শোবা হইলো চুল,
ঘরের শোবা শেতল পাটি
বিচনার শোবা হইলো নারী।

কথায় বলে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। ধর্মকথা শুনলেও সে

তার স্বভাব পরিত্যাগ করে না। মেদিনীপুর জেলার একটি খেমটি গানে সুন্দর এক উপমার সাহায্যে স্বভাব না বদলানোর কথা বলা হয়েছে—

এক পোয়া গুড় ঢাললাম আমি গাছের গোড়াতে
ফুল গো মিঠা, ফল গো তিতা স্বভাব দোষেতে।

নিচের গানটিতে একটি চিত্রকল্প খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ভগবান প্রেমময়। তিনি অসীম। অমোঘ আকর্ষণে তিনি ভক্তজনকে কাছে টানেন। সীমার বাঁধন ছিঁড়ে ভক্তও নদীর বেগে প্রেম সাগরের অভিমুখী হয়—লোক কবির বর্ণনায় তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে—

যেন ভাটার স্রোতে ভাটার গড়ান
সাগর যেন সদা গো টানে নদীর পরাণ
সে টান এতই সরল, মনেরই গরল অমৃত হইয়ে যায়।

দেশের রাজনৈতিক দলগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধ বোঝাতে লোকসঙ্গীতে সার্থক উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। একটি গম্ভীরা গানে উক্ত সম্বন্ধ বোঝাতে 'দা কুমড়ো' সম্বন্ধ বলা হয়েছে। ব্যাপারটিকে বোঝাতে এত সুন্দর এবং সহজ উপমা বোধ হয় আর হয়না।

দলে দলে দেখি দা-কুমড়া সম্বন্ধ
সর্বত্রই লেগে আছে দ্বন্দ্ব
গৃহ বিবাদ শিব না করিলে বন্ধ,
আমাদের জাতির হবে অবসান।

শিশুর মুখকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ী অঞ্চলের একটি ছো নাচের গানে

আইরে গোপাল কোলে লিব বজুড়া করে জীবন
চাঁদ মুখে চুমুক দিয়ে জুড়াই জীবন।

অন্য একটি লোকসঙ্গীতে উপমা ও চিত্রকল্পের প্রকাশ ঘটেছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। ফুল বাগানের শোভা যেমন ফুল—রাত্রির শোভাও তেমনি চাঁদ। মায়ের কোলের শোভা যেমন ছেলে। তেমনি পুত্রেরও শোভা তার জননী—

ফুল বাগানে ফুলের শোভা
রাত্রির শোভা চাঁদনি,
মায়ের কোলে ছেলের শোভা
পুত্র শোভা জননী।

বাংলা লোকসঙ্গীতের মধ্যে লোককবিগণ যে সমস্ত উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন —তার প্রায় সবগুলিই সংগৃহীত হয়েছে—লোকজীবন থেকে, নয়তো প্রকৃতি জগৎ থেকে নতুবা—সৌর জগৎ থেকে। এক কথায় বলা যেতে পারে লোকজগৎ থেকে এই উপমাগুলি গৃহীত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। উপমার এই সার্থক প্রয়োগ প্রমাণ করে লিখিত সাহিত্যের সাহিত্যিকদের থেকে, লোককবিদের দর্শন—অভিজ্ঞতা, প্রকাশভঙ্গিমা কোন অংশেই কম নয়।

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১. লোকসাহিত্য সংকলন—৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা পৃঃ ৬৮।
২ ঐ, পৃঃ ৫।
৩. লোকসাহিত্য (একাদশ খণ্ড) সম্পাদনা বদিউজ্জামান, পৃঃ ৩২।
৪ ঐ, পৃঃ ১০৭।
৫. ঐ, পৃঃ ৯১।
৬. ঐ, পৃঃ ৪০।
৭. ঐ, পৃঃ ২৪।
৮. ঐ, পৃঃ ২৬।
৯. বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকব—১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২১।
১০. ঐ।
১১. ঐ, পৃঃ ৩২৭।
১২ লোকসাহিত্য (একাদশ খণ্ড) সম্পাদনা বদিউজ্জামান পৃঃ ৭৪।
১৩. ঐ, পৃঃ ২৯।
১৪. নিজস্ব সংগ্রহ, টুসু, গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।
১৫. লোকায়ত ঝাড়খণ্ড বিনয় মাহাত, পৃঃ ৯৩।
১৬. ঐ, পৃঃ ২৮৮।
১৭. নিজস্ব সংগ্রহ, ধরমপুর, মেদিনীপুর।
১৮. নিজস্ব সংগ্রহ টুসু—গোয়ালতোড়, মেদিনীপুর।
১৯. লোকসাহিত্য (একাদশ) সম্পাদনা বদিউজ্জামান, পৃঃ ৮৪।

দ্বিতীয় খণ্ড

লোকসঙ্গীত সংগ্রহ

টুসু গান

১। কাল জল কর টুসু জলে তোমার কে আছে
আপনে বুঝে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।
জলে হেলা জলে খেলা জলে তোমার কে আছে।

২। টুসু দেখতে আলি তরা (তোরা)
টুসুর হাতে কি দিলি ?
আমরা দিলাম আমড়া আঁঠি
চুষে চুষে ঘর গেল॥

৩। টুসু দেখতে আলি তরা
ধরলি লো চালের বাতা।
বাতায় আছে কাল খরিশ
খাবে লো তোদের মাথা॥

৪। বান এল বর্ষা এল
ভেঁসে এল কুল পাতা।
কুল পাতাটি তুলে দেখি
তোদের টুসুর পেট কাটা॥

৫। বান এল বন্যা এল ভেঁসে এল কাঠমুড়া
কাঠমুড়াটা তুল্যে দেখি
ওদের টুসুর বাপ বুড়া।

৬। ওরে ওরে বাইক বালা
তোর বাইকে সিক ভাঙা
বাইক যদি সারাবি বলু
চলে যাব মানিকপাড়া।

৭। কাল দেখে নামলাম জলে
জল হৈল মোর একগলা।
ও প্রাণনাথ ছেঁকে তোল
রঙ দেখিবার নাই বেলা॥

৮। ওলো ও তোর টিকলি কপালে
তোকে বিয়ে দিব আকালে।
গয়না দিয়ে বিয়ে দিব
আশি সালের আকালে॥

৯। ছেড়ে দে অনিল রতন
ছেড়ে দে বাপ নীল রতন।
রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে
মরেছে লঙ্কার রাবন।

১০। তদের পাড়া বুলতে (বেড়াতে) এলাম
বস বলে কেউ বললি না।
তিতা দক্তা পানের খিলি
লে বলে কেউ বললি না॥

আমাদের পাড়া যাবি তরা
বসতে দিব সিংহাসন
সিংহাসনটি যেমন তেমন
পান দক্তাটি ঘন ঘন॥

১১। সর্‌য়্যান দাঁড়া পেরান যাঁয় আজি
তোর গা বাসাচ্ছে আঁশটানে॥

১২। ভেলা গাছটি হেলা হেলা
কত ভেলা ধর্‌য়েছে
ওই ছুঁড়িটা গান জানে না
কত কলা করেছে।
লে লিবি তিনটাকায় দশ ঝড়া।
ও তুই জানিস না গানের গড়া।

১৩। আঁকা বাঁকা রম্ভা পাকা
কলা পাতা তিন ডজন।
পোষ পরবে করব নিমন্ত্রণ
তোকে খাওয়াব মনের মতন।

১৪। ওলো ওলো বৌ দিদি
চুল রাখবি বে যতনে।
ফিতা দিয়ে বাঁধবি মাথা
আমার দাদার দলনে॥

১৫। শালবনির হলি গলি
মেদ্‌নিপুরের সুপারি।
পান খাঁযে লো ওগো সজনি।
আমার পানে দেয়া আছে
এলাচ লবণ দারচিনি।
আমি পান খাব না ঝাল লাগে
পানের বদল মিঠাই কিন্যা দে॥

১৬। তুই আলি ভাই আরেক জনা কৈ
আমি ভিজান ছিলাম চিঁড়া দৈ।
সারেঙ্গার লাল বাসেতে
আসছে গো মিঠাই থালা
ঘরকে চল কাঁদালে কেনে
তোর ভাব করাকে সব জানি।
চুল বসে না চিরুনীর দোষে
চিরুন ফেরত যাবে লাল বাসে।

১৭। এত বড় পোষ পরবে রাখলি মা
পরের ঘরে
পষ পরবের বাঁকা পিঠা
খালি মা কেমন করে।
আশদ গাছটি লড়ে চড়ে
মায়ের মন কেমন করে।

১৮। এত বড় পষ পরবে
সবাই পরে নীল শাড়ি
আমার বাবা হতভাগা
পাঠাল শ্বশুর বাড়ী ॥

১৯। মাথা ঘুসে রইলাম বসে
আর আমাদের কে আছে ?
মা মরেছে মাসি আছে
প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
বল ভাই আমার মা কুথা গেছে
আমি প্রাণ জুড়াব কার কাছে।

২০। রাধা রাধা বলরে বাঁশরি
রাধা আসবে শীঘ্র করি।
কদম গাছে হেলা দিয়ে
কৃষ্ণ বাজায় বাঁশরি ॥

২১। চল টুসু চল ফুলের লগনে
ফুল তুলব মরা দু'জনে।
নানা ফুলে মালা গেঁথে
পরব মরা দু'জনে ॥

২২। দুটি দুটি মুড়কি টুসু
কিছু মনে কর না
কাল সকালে ময়রা এনে
মুড়কির করব উঠনা।

২৩। মেদ্‌নিপুরে দেখি এলম
শিকড়ে বেল ধরেছে।
চল লো বেল তুলতে যাব
কার কমরে জোর আছে ॥

২৪। গাঁ কে এল সরু শাঁকা (শাঁখা)
বড় বৌদির মুখ বাঁকা।
হালের কাঁড়া বিক দাদা
বড় বৌ কে দাও শাঁকা ॥

২৫। আথ বাড়ির ধারে ধারে
ননদিনী গান করে
ও ননদ তো ঝাড়ব গরব
যেদিন লো তোর মা মরে।

২৬। আঁথ বাড়ীর ধারে ধারে
তিনটি কুটুম যায় চলে।
ও বড় বৌ বেরয়ায় দেখ
পাছে কি তোর ভাই বটে ॥

২৭। এতটুকু মুখটি টুসুর
উলখি বড় সেজেছে।
আ-মরি বলি হারি গো
প্রাণে বড় সেজেছে ॥

২৮। চল সজনী নামাল পালাব।
আমরা এ দেশেতে কি খাব ?
তুমি কইরবে রাঁধা বাড়া
আমি বাঁশি বাজাব।

২৯। বনফুলে গেঁথেছি মালা
গলে দিব হে চিকন কালা।
শ্যামের সঙ্গে উপবাসে
ছিলাম আমি অবলা ॥

৩০। চল টুসু চল নামাল পালাব।
ভেস্টে জমি সব নিল
এ দেশে থেকে কি খাব।

৩১। কেলেন কেটে রেখেছি টাকা
হাতে লিব গো সোনার সাঁকা
কেলেন কাটা কোম্পানীর টাকা
মাটি কাটা পাথুরা টাকা

৩২। টুসুর গলায় সোনার চাঁদমালা
টুসু দিওনা আমায় জ্বালা।
টুসু আনব পুজা করব
গলে দিব ফুল মালা॥

৩৩। বলগো আমার মা কোথায় গেছে।
আমি পয়সা লিব কার কাছে।
মা বাপের দুলালী
ভাজ ভাজের চোখের বালি।

৩৪। ডুবল বেলা ফুটল ঝিঙা ফুল
ও তুই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বুল।
একটি টাকার জন্যে লো তুই
করিস লো তুই এত ভুল॥

৩৫। রেল ছুটে রোলে গোলে
সাইকেল ছুটে কমরের জোরে।
মটর ছুটে সড়পে
সাইকেল চালাবে হে সাবধানে।

৩৬। আয় সজনী পিঠা করি আমরা দু'জনে
বড়কি দিল গন্নাগুলি
ছটকি ও দিল থলায় তুলে।
গুড় পিঠাটি উলটে যখন
দেখব সবাই নয়ন মিলে॥

৩৭। তোকে যে লো দেখেছিলাম
গুয়ালতোড়ের হাটে
আমার ভায়ের বউ হবি বলে কে জানে।

৩৮। আলু বেগুন কপি চাষ করি
আমরা ট্যাঁড়া ছিটে চাষ করি।
(ট্যাঁড়া কুঁয়ো)
এই কপিটার বার আনা দাম
তোরা ঝোল খাবি তো বাটি আন।

৩৯। প্রাণের সাথে মান দিয়েছি
তোব সাথে প্রেম করেছি।
গুযালতোড়ের হাট তলাতে
তোমাকে প্রাণ দিয়েছি।
পানের সাথে ওষধটা দিয়ে
তোমাব মনকে হেরেছি।

৪০। ছিঁড়ুক ছিঁড়ুক কন্টেলের শাড়ী
আমার ছোট দেওর কারবারী।
ছিঁড়ুক কাপড খাতিব করব না
আমি হাত লাইডব চলব না।

৪১। দে তুলে দে বেগুনের ঝুড়ি
আমি পিঁড়াকাটার হাট যাব
বেছে লিব লীল শাড়ী
সেই শাড়ী পরিয়ে আমি
যাব গো বাপের বাড়ী।

৪২। পাটা-শোলে নূতন কাপড় কলে
তরা আসবি গো সকাল করি।
নানা রঙের 'প্রাইজ' আছে
পাবি গো ভাল শাড়ী।

৪৩। গোয়ালতোড়ের আয়না চিরুনী
কলিকাতার ববি ফিতা
কত কৌশলে বেঁধেছি মাথা
তাও বাঁকা সীথা

গোয়ালতোড়ে ছিটকি নিব
শালবনী সেলাই দিব
সোনার বুতাম জামায় লাগাব
তোকে আগাই পিছুই ভালাব।

৪৪। আমার টুসু লইতে যাবে
জুন ঘাটে সরু বালি
দেখে দেখে বিয়া দিব
যার ঘরে সোনার ঝারি
চুল ঘুরেনি চিরুনীর দোষে
চিরুনী ফিরে যাবে পোষ মাসে।

৪৫। টুসু গানের মর্ম যে জানে
তারা পয়সা দিয়ে বই কেনে।
হাটে হাটে গাচ্ছে ওরা
ফণী পরাণ দুই জনে॥

৪৬। রাধার মনতো ঘরে রয় না
ছল করে যায় যমুনায়।
কলসীর জল ফেলে রাধা
ছলে চলে যমুনায়॥

৪৭। হাড়ের মালা গলে পরেছে
ভাং ধুতরা খেয়ে মদে মত্ত হয়েছে
বিয়ে করতে যাচ্ছে অসীম বর সাজে সেজেছে।

৪৮। আয় ললিতে সাজালো বাসর
কুঞ্জে আসিবে রসিক নাগর।
অগুরু চন্দন চুয়া ছড়া দিল তার উপর॥
আয় ললিতে মালা গেঁথে রেখে দেলো থরে থরে
আয় ললিতে সাজালো বাসর
কুঞ্জে আসিবে রসিক নাগর।

৪৯। লাল ফিতাতে বাঁধবি লো মাথা,
তোরে মানায় না কালো ফিতা ॥
কাল গায়ে লাল বেলাউজ
লাগাবি যাই আটা
লাল ফিতাতে বাঁধবি লো মাথা
তোরে মানায় না কালো ফিতা ॥

৫০। উল্টা পেঁচে বেঁধেছি মাথা
খড়্গপুরের আয়না চিরুনী।
কলকাতার গো বাবি ফিতা
শালবনীর হাটে ধনি কিনে দিব লাল ফিতা
উল্টা পেঁচে বেঁধেছি বেণী
খড়্গপুরের আয়না চিরুনী ॥

৫১। আমার সনে কর ভালবাসা।
তোরে কিনে দিব কান পাশা।
কান পাশাটি পরে ধনি—
যবি লো পিড়াকাটা
আমার সনে কর ভালবাসা ॥

৫২। গাঁদা ফুলে গেঁথেছি মালা
মালা পরাব রে হিপিবালা
তোমার কেঁদে কেঁদে পাগল হোল শ্রীরাধা
আমার বন্ধু মন মানে না
যাব হে সন্ধ্যা বেলা।

৫৩। বল টুসু ধন চাঁদ কথায় পাব, গাছের ফল বটে তুলে দিব
শহরে শহরে যাব, মাঝ শহরে দাঁড়াব।

৫৪। যারেই দেখব পাকা দাড়ি ভেলা তেলে
ভেলা তেলে ছাঁকে ঝাড় বড়া সেতো চক বাজারের থালভরা

৫৫। বামুন ডিহার বাঁধ ভেঙ্গেছে কাশ বহালকে ঢেউ আসে
বাহিরাওরে গাঁয়ের সঙ্গতি
জড়া কোকিল যায় ভাঁসে
রং খেলব পাশা জিতব আট আনি
যেমন দুয়ারসিনির চাটানি।

৫৬। জৈড় তলাতে তাতা বালি, আমরা লো পুড়ে মরি
পেঁকা সতীন চলে গেল চলনে সাবাস করি
রং সতীন আমার জনমের বাদি,
সিঁদুর পরিব লো আজ বাদি

৫৭। আয়না লে লো মাথা বাঁধাব তো
সড়প ঘাটায় নাচ লাগেছে দেখবি ত
সড়প ঘাটার পান খায় না পানে পকা লাগেছে
এক ছায়ের মা দুছায়ের মা তিন ছায়ের মা মরেছে
ভাল হয়েছে
ঘরের কেল কলিটা খাঁয়েছে।

৫৮। আয় সারদা আয় বরদা কুলিতে বাঁদ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান করে ঝরকায় চুল সুখাব
রং বল টুসু ধনি তোকে কে দিল লো দু আনি।

৫৯। আমরা টুসুর সঙ্গীত করেছি আমদানি
কেঁন্দে কুড়ার চক বাজারে মনহারি দকানে
কত নাটক নভেল সুগন্ধি তেল
আর কত পাউডার হিমানী।

৬০। টুসু যায় মা কোলে কোলে
আমরা যাই মা চলে
টুসুর সঙ্গে দেখা হবে
সেই কদমের তলে
আর কি প্রাণে ধৈর্য্য ধরা যায়
আমার কোলের টুসু জলে যায়।

৬১। চল চল চল নাইতে যাব
কুলিতে বাঁধ বাঁধাব।
কুলির জলে স্নান করে
ঝরকায় জল শুকাব।

৬২। তবু চুল শুকায় না
একটি চুলে বাঁধব মাথা
বাপের ঘর যাব বলে
গুনের ননদ কাঁদতে বসল
বাসক ফুলের ডাল ধরে
কেঁদনা কেঁদনা ননদ
আসব মাসের শেষ করে
মাস গেল শেষ হল তবু বৌদি এল না।

৬৩। আমার টুসু হাল করিছে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
বেছে বেছে কামিন করব
ঘাড় মটা কমর সরু।

ভাদু গান

১। ভাদুর রূপের নাইরে তুলনা
ভাদুর গা যেন কাঁচা সোনা।
কপালে সিঁদুরের ফোঁটা
কানে দুলছে জোড় সোনা।
ভাদুর রূপের নাইরে তুলনা
ভাদুর গা যেন কাঁচা সোনা।

২। আর তিন যাক জামাই, খাতে দিব পাকা পান
বসতে দিব সিতারপাটি, সোনার মুকুট করব দান
চল প্রাণ সজনি।

৩। বাড়ী নামর নারিকেল গাছ গো, ঘটি ভরে জল দিব
একটি নারিকেল চুরি গেলে ডাকে চিঠি পাঠাব।
চিঠি পাঠায় ঘড়া পাঠায়, তবু জামাই আইল না।
জামাই আসা বড় আদর, তবু জামাই আইল না।
চল প্রাণ সজনি, ভাদুর লগে সাজাব গো
ফুলদানি।
রং চল প্রাণ সজনি···ভাদুর লগে—

৪। আমি ভাত খাবনা, আমার চাল দিতে কর মানা,
আমি ভাত খাব না
আজকে আমার পেটের অসুখ গো।
চিঠি লেখব একখানা, লেখব চিঠি কড়া করে,
এইখানে আর থাকব না
আমি ভাত খাব না।

ঝুমুর গান

১। মিনির মায়ের বাঁইকে গেছে মন গো
যেমন কুকুর ল্যাঞ্জের মতন
যেদিন আমি টাকা কড়ি
সেদিন রাঁধে ভাত মুড়ি।
আবার করে উপর‍্যা যতন গো।

২। ও যদিও যাই যমুনার জলে
ওলো ফিরে চাইব না কদম তলে।
চূড়া বাঁধা একটি রাখাল
বইস্যা আছে তার তলে।

৩। ভেজাল ভেজাল ভেজাল আজকালে
বসেছে কদম তলে।
তেলে ভেজাল দুধে ভেজাল
আর ভেজাল গরম জলে।
তারপরে ভেজাল বসেছে কদম তলে।
বাটি বাটি পিয়ে লিল
হাঁড়ি হাঁড়ি জল ভেজালে
ও দিদি ভেজাল আজকালে।
ওষুধ ভেজাল, চা ভেজাল
আর ভেজাল বেসনে
তেলে ভাজা খাব না কিনে।

৪। গঙ্গার তীরে নর হরি
দিবেরে মন তোর কাষ্ঠের তরী
ও তোর গৌতমেরই
বাম পদে পরশিতে
কাষ্ঠের নৌকা হইলেন প্রতিমা
হরি বুঝলাম হে
গোবিন্দের কি মহিমা।

৫। কতছলে যাই গো জলে
শ্যাম দাঁড়াইয়ে কদম তলে।
আমরা বসন রেখে
নামিয়া ছিলাম জলে।
লে গো বসনচরা বসন
তরা দুটি বাহু তুইলে
এত দিনে কলঙ্ক ঘটিল রাধার কুলে।

৬। শ্যাম আমার গুণমনি
প্রেম আমার ওগো ধনি।
গত নিশি ছিলে হে কার কুঞ্জেতে—
নিশি ভোরে দেখা দিলে

কার কুঞ্জে শ্যাম মজে ছিলে ।
এখন উইঠে যাও শ্যাম
না থেকো মোর কাছে হে ॥
যাও চন্দাবলীদের কাছে
এখন চন্দাবলীর মুখে
কতই না মধু আছে হে
উইঠে যাও শ্যাম না থাক মোর পাশে
এখান থেকে উঠে গেলে
আমরা দিব ছড়া ঝাইট হে
যাও চন্দাবলীদের কাছে
হেন শ্রীদামে ভনে আজ যুগল চরণ
কেনে দিলে
না থেকো মোর পাশে হে ॥

৭। একদিন কুঞ্জ বনে
শ্রীরাধা পড়েছে মনে
জটা বাকুল হইল শ্যাম রায়
বলছে দে গো মুরলী হাতে
সখাগন নয়্যা সাথে
আন্যে সখি রাধারে মিলায়
ও বাঁশি রাধা বল মন
জুড়ায় যেমন জীবন তার ।

৮। শ্যামের ও গো বাঁশি শুনে
মন থামে না ঘরে কেনে
আজ ঐ বাঁশি খুলে দিল কালি রে ।
বাঁশির সুরে আমি রইতে নারি ।
যমুনা যাই বারি বারি
রইক্ষা কর প্রভু আমার
তবে আমি গো জোড় হাত করি ।
বাঁশির সুরে রইতে নারি

প্রভু আমায় বলেন নাচের ভিখারী
হেন শ্রীদাম ভনে বাঁশির জ্বালা এখন কেনে
প্রভু তোমার চরণ দুটি ধরি।

৯। কি দোষে প্রেম ভাইঙল শ্রীমতী গো
গাছ ছাড়া ফল নাস্তি
উইঠে গেল ব্রজের বসতি
আমি বহু সাধে করে ছিলাম পীরিতি গো।

১০। দেখি সেই কেমন নারী
আমা হতে কত সুন্দরী।
আজ পেয়েছে শ্যাম
কুব্জা সুন্দরী গো।
তবে এতই যদি ছিল মনে
আমাই না বলিলে কেমনে—
যাও শ্যাম চন্দ্রাবলী কুঞ্জেগো।
লুকালে লুকালে যাই
নয়নে তার চিহ্ন পাই
প্রতি চিহ্ন আছে গায়ের বসনে গো
যাও শ্যাম চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গো।

১১। লক্ষনেরী কোলে করি কাঁন্দিছেন রাম ধনুকধারী
বল হনু করি কি উপায়।
রং বিধি হায়রে হায়রে বিধি এহে দুঃখ সহনে না যায়

১২। গৃহেতে হারালেম পিতা কাননে হারালেম সীতা
রনেতে হারালাম গুণের ভাই
রং বিধি হায় রে।

১৩। কাঁদেন রাজা বিভীষণ বনের ভল্লুকগণ
জাম্ভুবান কাঁদে ধুলাতে লুটায়
রং বিধি হায় রে।

১৪। বিনোদ সিংয়ে গায় ঝুমুরে বানাই গো তার
ঔষধ আনিতে হনু যায়
রং বিধি হায়রে হায়রে বিধি
এহে দুঃখ সহনে না যায়।

ঝুমুর গান বর্ণনাকারীগণ--

১. ফটিক ঘোষ ৩৬, পিংবনী, মেদিনীপুর।
২. ভোলানাথ কর্মকার ৪০, তিলাবনী, মেদিনীপুর।
৩. বিকাশচন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোষ্ট—বান্দোয়ান, জেলা—পুরুলিয়া।
৪. শচীকান্ত সামন্ত, সিঁর্তিবন্দা, মেদিনীপুর।

খেমটি গান

১। কুলি কুলি যেতে ছিলাম
আর পাড়ার ছেলে দেখেছিল
বলে আঁখি ঠের না
নৈতন যৌবন আমার টাচ (Touch) কর না ॥

২। সকালে বিকালে নিমাই মা বলিস না
নিমাই আমার কার কথা শুনলি
আলো ঘর আঁধার করে গেল।

৩। উপর পাড়ার ডালিম গাছটা
ডালিম ধরে মোটে দুটা।
গাছের ডালিম গাছে শুকাল
তবু প্রিয় কৈ এল।

৪। আম পাতা, জাম পাতা, বাঁশ পাতা সরু
বেছে বেছে পিরীত করবে বঁধু
যার কোমর সরু।

৫। ভাইগনা বল্যনা মামী
সকালবেলা দেখাদেখি
সই-ন্যায় হয় স্বামী।

৬। কমনিষ্ট সরকার রাজত্ব করে
মোরা বাঁচব কি করে '
পশ্চিম বঙ্গ কেরালা আর ত্রিপুরা রাজ্য ঘেরে
কমনিষ্টের এই তিনটি রাজ্য আছে ভারত ভিতরে।
তিনটি রাজ্য ভরে আছে সি. পি. এম.
ক্যাডারকে বড় করবে বলে
গরীবকে চুষে মারে।
সি. পি. এম. ভাল
সরকার ভাল ভাল পেলেন করে (পরিকল্পনা)
কিন্তু পেলেন তারা না সার্থক করে
পকেটে টাকা ভরে।
বিশেষ করে মেদনিপুরে এই গোয়ালতোড়ে
যতকিছু কাজ করে টাকা মেরে ফাঁক করে।

৭। মোদের গ্রামে দুটি কুঁয়া সি. পি. এম. মঞ্জুর করে
সাত হাজার টাকা বিল ছিল ঐ দুটি কুঁয়ার তরে।
সম্পূর্ণ না করে কুঁয়া টাকা নিল মেম্বারে
কুঁয়া দুটি হল কিনা তদন্ত কেউ না করে।
এক'শ টাকায় একটি কুঁয়া বার হাত খনন করে
রাজেন বলে বাকী টাকা মেরে নিল ক্যাডারে। *

৮। যাবার সময় হইছে এইবার
শুন হে ভাই নন্দকুমার
পয়সা কড়ি নাই হে আমার
প্রভুর চরণ দুটি নৌকা করি
কর পারাপার।

৯। শ্যামের বাঁশি গো রই কেমনে
যখন কালা বাজায় বাঁশি
তখন আমি জলকে আসি
দুকুরে কাঁদিতে পারি
ধুঁয়ার ছলনায় কানতে বসি।

১০। পাকলে ডালিম সবাই খাবে
কাঁচায় তার কিবা আশা ধন
ও ডালিম পেড়ো না এখন।
আছে যেন রসে ভরা।
কাঁচায় পাড়লে কি আস্বাদন পাবে তারা
সেই ডালিম পেড়ো না এখন।

১১। মাদাল পাতা চিরি চিরি তিনগুছি বিনুনী
ও ভাগ্না বলো না মামী
সন্ধ্যা হলে ভাগ্না তুমি আর আমি ॥

---

* ৬ এবং ৭নং গান বর্ণনাকারী—অজয় মাহাতো-৩০, গোলকচন্দ্র দাস-৩৫, গ্রাম—ধরমপুর, পোঃ—দেবগ্রাম, থানা—গোয়ালতোড়, জেলা—মেদিনীপুর। সংগ্রহের তারিখ—৯।১১।১৯৮৬।

গরু খুটান গান

কুন পয়ঠে খরজে বাগ্ বাগিনী
কুন পয়ঠে গরজে এ ষাঁড় ॥
কুন পয়ঠে গরজে এ গাঁয়ের খেরি গরাম্
কুন পয়ঠে গরজে এ রাজা
কুন পয়ঠে গরজে এ বাগ্ বাগিনী
পলে পয়ঠে গরজে এ ষাঁড়
গাঁ পয়ঠে গরজে এ গাঁয়ে খেরি গরমে
কাছারি পক্ষ্য গরজে এ রাজা গো

ক্যায়েসে যে বধ হবে বাগ বাগিনী
ক্যায়সে যে বধ হবে ষাঁড়
ক্যায়সে যে বধ হবে গাঁয়ে খেরি গরাম
ক্যায়সে যে বধ হবে দেশ পতি রাজা
কাঁড়ে কাঁড়ে বাঁশে বধ হবে বাগ্ বাগিনী
হালে ফালে বধ হবে ষাঁড়
দুধে গুড়ে বধ হবে গাঁয়ের খেরি গরাম
পাঁজি পুঁথি বধ হবে দেশ পতি রাজা ॥

২। এত দিন যে খালি ভালা পাহাড় বাইদের খা ঘাসরে বাবু হো
আজ তোর দেখিব মরদান
চারি পায়ে ঝাঁকিবি, দুই শিংয়ে মারবি খেলি ঘোল ধুলা
উঁড়ি যায়।

৩। ছুঁটু মুটু কুইলা বলদরে বাবু হো
চরণ বনে যাইত বড়ি ধুর
চারি পায়ে ঝাঁকিবি দুই শিংয়ে মারবি
রাখে দিবি বাগালের নাম।

৪। গলায় যে খাল ভালা ঘাস আর ভাতরে বাবু হো
বাগালে তো খাল বাঁশি মাড়
আজিকের দিনে বাবা না দিহ বদনাম রে
রাখি দিবি বাগালের নাম।

৫। জাগো মা লক্ষ্মী, জাগো মা ভগবতী বাবু হো
জাগে কা আমাবস্যার রাত
জাগেকা পতিফল, দেব মা লছুমল
পাঁচপুতায় দশ ধেনু গায়।

৬। হামরা যে যাতে ছিলি আগিনা শহরে রে বাবু হো
তরি গলায় ডাকিরা ঘুরায়
জানেকা পতিফল দেব মা লছুমল
পাঁচপুতায় দশ ধেনু গায়।

৭। অহিরে নাহি যে আসি হামরা
মুড়িকের লো ভেরে বাবুহো নাহি আসি
মিঠা কেরি লোভ
তরি ঘরে আছে ভালা ভগবতী গায়রে
চাঁদ সুরুজে টল মল।

৮। কেতি ধুরে আসছে, হাতি বল ঘড়া রে বাবু হো
কেতি ধুরে আসিছে বরাইত, কেতি ধুরে
আইল নয়না সুন্দর বর
চাঁদ সুরুজে টল মল।

কাঠি নাচের গান

১। আখড়া বন্দনা করি যত সখি থারা থারি
চন্দ বদন মুখ হেরি, এস ধন কোলে করি

২। কচি কদমের তলে কৃষ্ণ ঘুমাল কোলে
হাতের বাঁশি নিয়ে গেল চোরে
না জানি শ্যাম ঘুমের ঘোরে।

৩। হাট যাব বাজার যাব হাতে লিব শিঁশিঁ হে
পরে লিব সব সয়দা আগে লিব নিশিহে,

৪। আমার বঁধু রাত কানা বাড়ীর পথে আনাগনা
দেখ্য বঁধা গোবর গাড়ায় ঢুকনা
মরিলে খবর পাব না।

৫। বাড়ী বাড়ী যাহনা, কাগজি ফুল তুলহনা
কাগজি ফুলের মালা বঁধুর গলায় দিহনা।

৬। তুঁই আমার জামা জড়া, তুঁই মাথার পাগড়ি
তুঁই আমার আয়না চিরুণী লো সজনি।

৭। খেলা রসে ছিল কানাই
সীদামেরি সনে
হেন কালে শ্রী রাধিকা
পড়ে গেল মনে।
ওগো সখী নাই দূতী নাই
কারে নিয়ে যাবে।
শ্রীরাধার কুঞ্জে গিয়ে
নাপিতানী হবে।
তখন কক্ষেতে চুপড়ি ঠেকা
হস্তেতে নরুনী।
ওগো ধীরে ধীরে যান নাপিতানী
যথা বিনোদিনী॥
দ্বারে গিয়া নাপিতানী ডাকে ঘনে ঘন।
কুঞ্জে ছিলেন অষ্ট সখী শুনিলেন তখন।
অষ্টসখী বলে নাপতান কত কড়ি নবে। (লইবে)
ছয় কুড়ি কড়ি আমি অগ্রে গুনি নেবে॥
যে জন পরিবেন আলতা তাহারে পরাব।
ওগো অষ্টসখী বলে মোরা কেহ না পরিব।
কুঞ্জে আছেন শ্রীরাধিকা তাহারে পরাব।
তখন কক্ষেতে চুপড়ি ঠেকা হস্তেতে নরুনা॥
ধীরে ধীরে যান নাপতান যথা বিনোদিনী।
বলে বইশহ কম্বল আসনে না হেলাইও গা॥
অগ্রেতে বাড়ায়ে দিল দখিনের পা।
ধীরে ধীরে চাছেন নাপতান দুটি পায়ের নংখ॥
নংখ চাছিয়ে নাপতান ভাবে মনে মনে।
আপনার বঁধুয়ার নাম লিখিল চরণে॥
বলে—কি কর্ম করিলে নাপতান
কি কর্ম করিলে
আপন বঁধুয়ার নাম চরণে লিখিলে।
জল আনি দেহ সখী আলতা ধুয়ে দিব
আলতা উঠি বঁধুর নাম না উঠিল॥

তখন রাই ধনী বিনোদিনী ধ্যানেতে জানিল ॥
ধ্যানেতে জানিল ব্রজের কানাই আইল।
তখন রাধাকৃষ্ণ দুই জনে মিলন হইল।
গোবিন্দ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল ॥
(বর্ণনাকারী- গোলক দাস—ধরমপুর, মেদিনীপুর)

পাতানাচের গান

১। সরকারের এমন বুদ্ধি
ইস্কুল ডাঙায় জড়া খুঁটি,
তার উপরে দিল চীনা মাটি।

২। যার মাথায় চুল নাই।
দড়ি গছা গছারে।
আইনব বাঁধের চোচড় (গাছ)।
বাঁধিব তোর মাথা রে।

৩। শুকনা লইটা খাড়া।
শুইয়া শুইয়া দেই সাড়া।
তুমি যাবে হে আমাদের পাড়া
বিনা সুতার মালা দেব গলে।

৪। সি. পি. এম. এর আইন কড়া
পথে ঘাটে লগ গো মারে তারা। (মানুষ মারে)
ধনী গিলা এতই বকা ছিল,
খাস জমি মাইরা খেতে ছিল।

৫। কন দকানে ঝর্ণা শাড়ী
কে দিল খরিদ কর‍্যা।
ও দিদি ঝর্ণা শাড়ী লিলু কি দরে
দিদি বইল্যে দওনা আমারে।
ঝর্ণা শাড়ী কে বলে ভাল
দু'দিন পরে হয় কাল।

৬। পাইয়া বাঁশরী হাতে
লাগিল রাই বাজাইতে।
ঐ বাঁশি কিছুই না বলে,
ঐ বাঁশি বলে রাধে রাধে

৭। অমাবস্যা পূর্ণিমা চাঁদে
লেগেছে গ্রহণ।
তোরা দেখে যা গো
নাগর যুগল মিলন।

৮। কারও বসন বিনা লুটে
পেয়েছি পুকুরের ঘাটে।
যতনে রেখেছি বসন কদম্বে তুলিয়ে
বসন লও গো আসিয়ে।

৯। রাই বলে করে ধরি।
কুথায় হে নাগর হরি।
একটি কথায় মিনতি করি
দাও হে তুমার বাঁশিটি বাজাব।
যদি না দিবে হে বাঁশি,
একলা থাকিবে বসি—
ডাকিলে তো আর না আসিব
দও হে তুমার বাঁশিটি বাজাব॥

১০। শোলে * শোলে এল বান (শোলে—মাঠে)
ভাষাইল মা লক্ষ্মীর ধান।
আড়ে বইসে চাষী ভায়ের নয়ন ঝরিছে
কিসে বাঁচে প্রাণ মহাজনকে কি দিব জবান॥

১১। কালো বিড়াল কে পুষিছে
কয়লা পাড়াতে।
ভাঁড় ভেঙেছে দই খেয়েছে,
মুখ পুঁছেছে কাঁথাতে।

১২। আমার বচন ধর নটবর ভেশ১ কর
(১-ভেশ—বেশ—পোষাক, শয্যা)
গায়ের ভেশ রাখ গো ভূমেতে।
তবে গো মুরলি দিব হাতে।
খুলে ফেল তাড়বালা, গলে পর বনমালা
গায়ের ভেশ রাখ গো ভূমেতে।
তবে গো মুরলী দিব হাতে।
সঁীতার২ সিঁদুর পুঁছ (২-সীতা—সিঁথি)
বেণী গাঁথা খুলে রাখ আজ রাতে।

১৩। ভাদ্র মাসের আকালে
ছেনা কাঁদে গো সকালে।
দুটি খাবি দুটি ঢাকায় রাখবি
ছ্যানা কাঁদা মনে রাখবি। (ছ্যানা—ছেলে)

১৪। যার মাথায় কাল ফিতা
সেইটা বটে ছ্যোলার কাকি।
ছ্যোলার মাত ছ্যোলার বেদন জানে না
তায় ছ্যোলা কাকি বলে না।

১৫। দেখেছিল সিনাতে (স্নান করা)
স্যাঁকা ভাঙা সড়প ঘাটে, (স্যাঁকা--শাঁখা)
মাথার চুলকে ছেড়ে দিয়ে
গায়েতে সাবান মাখে
মনে করে ছিলাম ধনি
লিয়ে যাব হাটেতে।

১৬। পরের পরান বন্ধু কেন এলে এখানে
তার প্রাণে বিচ্ছেদ হবে
সে মরিবে পরানে
তুমি তরু আমি লতা
বন্ধু তোমায় ছেড়ে যাব কোথা
যাও যাও ফিরে যাও মন বাঁধা যেখানে
অন্তরে যে গুমরে মরি তোমায় কথার এখানে।

১৭। ও ভাই কানাই রে বনমাঝে
রাধা কোথায় পাই।
গাছের ফল নয়রে কানাই
পেড়ে দেব তোরে।
জ্‌টিলা কুটিলার কাছে
রাধা আনার বাধা আছে
সেখানেতে যাবে মিছে আসবে না তোর রাই
বন মাঝে রাধা কোথায় পাই।

১৮। চল সখি চল বনে যাব
আর ফুলের বালিশ করব।
সকালে বিকালে ফুলের বিছানা
কিয় দোষে আমার নাগর এল না॥

১৯। অমাবস্যা প্‌র্ণিমার চাঁদ
সেই রকম ছিল গো আমার শ্যাম।
শ্যাম আমার কার কথা শ্‌নল
আলো ঘর আঁধার করে গেল।

২০। মহ্‌ল পড়ে একটা একটা
একলা কুড়াব কটা
আজের মহ্‌ল গেল রে তিন ঠাকা।

২১। বাঁশিটা বাজিল বনে চললো রাই শ্‌নে আসি
কি জন্য ডাক দিল বনে বাঁশিটা বাজিল বনে।

২২। কাঁড়া মারিলে শিং জোড়া নিশান রয়ে
মান্‌ষ মারিলে পরে কিবা রয়ে চিন্‌ (চিহ্ন)
ব্যথায় গেল দিন
নারী জীবন পরের অধীন।

২৩। প্রাণ সখা হে
আজ হতে ফুলচোরা
মনচোরা ননীচোরা নাম রইল তোর।

শ্যামের লাগি বাসর সাজি
বসে রইলাম সারা নিশি।
জেগে জেগে নিশি হলো ভোর
প্রাণ সখা হে।

২৪। একটি দুটি ফুল ফুটেছে
নীল কালো সাদা
কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে
কোন ফুলে রাধা।

২৫। থালা ঘটি মাজবে ঘরের
কোনে রাখবে ভেঙ্গে গেলে
গলায় ধরে কাঁদবে।

২৬। হাতে হাতে ভিক্ষা দিতে
সীতাকে ধরিয়া চাপাল রথে—
সে রথ আনিল রাবনে
কাঁদে সীতা রঘুনাথ বিনে।

২৭। বার বছর পথে যেতে
ওষধের গাছ আছে
হনু বই আর কেহ নাই আনিতে
গন্ধমাদন চিনিতে।

২৮। একটু নবনীর তরে মায় মারিল গালে
প্রাণ কাঁদে যশোদার কোলে
চলে যাব অযোধ্যা নগরে।

২৯। দুইয় হাত যোড় করি কহিছেন রাই
বংশীধারী ও প্যারী নটবর
কেন প্যারী না দিলে উত্তর।

৩০। শুনরে সুবল ভাই
গোষ্ঠে যাওয়া হয় নাই
তোর বেশে মোর অঙ্গ ঢাকিল।

৩১। কয় দয় না লুকাল রে।
ঝড় না বাতাস না
রথ উড়িল রে।
কোথায় ছিল জটাই পাখি
রথ ঘেরিল রে।
ছাড় ছাড় ছাড় জটাই
রাবনের রথরে।
হাতে আছে গন্ডীর বাণ
বধিব পরাণ রে।
হাত ভাঙ্গিল জটাই
পা ভাঙ্গিল রে।
পড়ে রইল জটাই
পর্বত সমান রে।

৩২। প্রাণনাথ হে অসময়ে দিয়ে দরশন
চিতে বাঁচাও হে জীবন।
কুটিলা যে দাদাকে নিয়ে আসছে নিধুবন
দুই জনে বধিবে পরাণে প্রাণনাথ হে।
এ সময়ে দিয়ে দরশন
চিতে বাঁচাও হে জীবন।

৩৩। ঘরে আছে কাল ননদী সে তো বেড়া জাল।
শ্যামের বাঁধি রে
শ্যামের বাঁশি করিল কাল।

৩৪। সীতা মাগো তুমি আর কেঁদ না
কেঁদ না ভেব না মনে।
রামের চিহ্ন দুখ এনে
এই লাও মা সনার অঙ্গুরী।
সীতা মাগো, তুমি আর কেঁদ না,
ওমা জানকী কেঁদ না মা অশোকের বনে।

এসেছি মা অশোক বনে
মেরেছে সব চেড়ি গণে।
কি করে ঘরকে যাব
উপায় বল না
সীতা মাগো তুমি আর কেঁদনা ॥

৩৫। হাতে তম্ব কাঁধে ঝুলি
দুয়ারে দুয়ারে বুলি (ঘুরি)
ভিক দিলে ভিক লেয় না কেনে
কাঁদে সীতা রঘুনাথ বিনে।

৩৬। রাম রাজা হবে বলে
আনন্দিত মন।
দখিন দরজায় দেখ
কপাটে লিখন ॥

৩৭। তোর ছানা জগর যায়
আমার ছানা কাছাড় খায়
ও বাছা ছানারে
জনার খাড়া ছেচরা ফুটাই দিব রে ॥

৩৮। নিমাইকে দেখেছে যেতে
পদচিহ্ন পড়ে আছে।
ও নিমাই মা বলেছিল
হায়রে সাধের নিমাই
কোথায় বা গেল ॥

বর্ণনাকারীগণ—১. গোপাল মাহাতো, গ্রাম—শ্যাকাভাঙা, পোঃ—দেবগ্রাম।
২. গৌর পাত্র—আনুশোল ; ৩. নন্দ মাহাত—ধরমপুর।
৪. অবনী পাল—আনুশোল ; ৫. গৌর পাত্র ; ৬. রণজিৎ মাহাত—ধরমপুর।

ইদ পরবের গান

১। বরা বাজারের ইন্দ, চাকোলতোড়ের ছাতা হে
কাশীপুরের পার্বন পরবে বড় মজা হে।

২। ইন্দ পরবের লাগে গেলি বাপের ঘরকে
ভাইয়ে ভাজে জবাব দিল নাই বলিল থাকতে।

৩। বড় দাদা বড় বহু সবাই দেখিল আসতে
মাঝলি বহু হামাদের নাই পারল সইতে॥

৪। ইন্দ পরব লইজকাল, বুড়া আল লিতে লো
কি বলে জবাব দিব, বুড়া রইল বসে লো।

৫। পায়ে আলতা কুলি, কুলি কাদা তাই আসছে লিতে লো
যা গো মা তুই বলে দিবি তোর জামাইকে যাতে লো।

৬। বার মাসে তের পরব
ভাদর মাসে ইঁদ রে।
চল দেওরা১ বেরি২ যাব ইঁদ দেখিতে
ইঁদ দেখালি দেওয়া শ্যাখা পরালি রে
আর ঘুরাইয়া আন্যা
মাইর খাওয়াইলেরে॥

(১-দেওরা-দেবর ; ২-বেরি-বাহির হইয়া)

কর্ম সঙ্গীত

ছাতু তুলা

ছাতু তুলা সে বড় নজর গো
ছাতু উঠে অরুন নেচে।
সব নারী গাই ছুটে এসে
দরশিল পুটুলা চিতি বিবে।

জবর জবর গো ছাতু তুলা
সে বড় নজর গো।
মোঢ়ালেরই ডাঁটা লড়বড়
আঁচলেরি ভিতর—
ছাতু তুলা সে বড় নজর গো।

(বর্ণনাকারী : বজ্র লোহার, ভেদুয়া, গোয়ালতোড়. মেদিনীপুর।

বিবাহের গান

সম্বন্ধ পাতানোর গান :

১। বারে বারে বারণ করি, ঐ গাঁয়ে ঘর জুড়িয় না
ঐ গাঁয়েয় লোক বাবা কুটুমের মান জানে না।

কুটুমের মান জানে যদি, গামছা পালে ধুতি পরে না
বাঁধা থাসি বাঁধাই রইল বিরির ডাল বই দিল না।

বরগমনের গান :

২। বর আনবে বরাত আনবে বরের ভাইকে আন না
বরের ভাইয়ের অলগা ধুতি আমার অঙ্গে সহায় না।

৩। কিসের এত ডেরি জামাই, কিসের এত ডেরি
তোমার বাবার পালকি সাজাতেই হল নাকি ডেরি।

৪। আম তলে থাবে বাবু জাম তলে শুবে গো
সদরে সামাবে বাবু ঐ গাঁয়ের কুলি গো।

বরকে তেল হলুদ মাখানোর গান :

৫। চারি দিকে চৌ খন্ডন চন্দনের পিঁড়া গো
হাত মেলিয়া দেরে বাছাধন মাথাব সুগন্ধ চন্দন।

বিয়ে বাড়ীতে ছামড়া তলার গান ঃ

৬। আজ আমাদের খাসারিকা ডাল গো
আজ আমাদের খাসারিকা ডাল
পেট করছে গাজার গুজুর বুঝাইব কাল লো
আজ আমাদের খাসারিকা ডাল।

৭। আজ আমাদের ছোট বাবুর বিহা লো
আজ আমাদের ছোট বাবুর বিহা
মদ খাব বতল বতল নাচব ডিডিগ ডিয়ালো।

বর-কন্যা বিদায় গান ঃ

৮। এক শিলের হলদ বাঁটা, ভিনু ভিনু কেনে রাখেছ
যেদিন জনম সেদিন মিলন আজ কেন কাঁদিছ।

৯। আগুই আগুই দুধের ঝারি পেছুই পেছুই গাড়ি গো
আস্তে আস্তে চালাও গাড়ি বাবার রোদন শুনিগো।

বাবার রোদন যেমন তেমন
মায়ের রোদন ভারী গো।

ঐ রোদনায় ভিজে গেল
মেঘ ডুমুরা শাড়ি গো।

১০। এক কোশ গেলে মুনু দুই কোশ গেলে গো
তিন কোশ গেলে মুনু থমকে দাঁড়ালে গো।

কাকে মনে পড়ে মুনু, মাকে না বাবাকে ?
মাকে নাই বাবাকে নাই গো
খেলিবার সাংগাতকে।

বরের বাড়ীতে বৌকে নিয়ে যাওয়ার গান :

১১। থাকলো কন্যার মা শুধা ঘরটি নিয়ে
তোর বিটিকে নিয়ে যাচ্ছি গিড়লা গাড়ুম করে।

১২। ছামড়ারি পাতগিলা, বাজে রুনু ঝুনু
ভাগ্যে ছিল আমার দাদা লো বহুআলি ছুমুর ঝুমুর

১৩। রাত বারটা বহু দিন বারটা
তোর বাবা বলে ছিল লো বহু খাল বারটা।

১৪। এত এত বরাত গেল পুয়াল কুঁড়ে ডেরা
তোর যদি ভাই থাকত লো বহু ঘরেই দিত ডেরা।

১৫। কুলি কুলি আলি বহু কুলু ঘর সামালি
কুলু ঘরের খৈল খায়ে লো,
বহু মটাই বাইরালি।

বরের বাড়ীতে কন্যা পোঁছানোর পর বধূ বরণের গান :

১৬। আম বাগানে ফুল বাগানে বাদলি হাওয়ায় গো
কন্যার বাবা সাইকেল দেয় না বাজার ঘোরিতে গো।
আম বাগানে ফুল বাগানে বাদলি হাওয়ায় গো
কন্যার বাবা ঘড়ি দেয় না টাইম দেখতে গো।

সহায়ক গ্রন্থ

১। অরণ্য সংস্কৃতি—আব্দুস সাত্তার, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।

২। উত্তর রাঢ়ের লোকসঙ্গীত -দিলীপ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী প্রকাশন, কলকাতা-১, ১৯৭০।

৩। কাঁথির লোকাচার।

৪। কুমিল্লা জেলার লোকসাহিত্য—তিতাস চৌধুরী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

৫। চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য—ওহীদুল আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৬। চলনবিলের লোকসাহিত্য—আব্দুল হামিদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১।

৭। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান—ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৭৩।

৮। ধলভূমের লোকগীতি—২য় খণ্ড ঃ মকর—ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, কলিকাতা।

৯। ধলভূমের লোকগীতি—বাঁধনা, ড. চিত্তরঞ্জন লাহা, ১৯৭৮।

১০। নৃ-তত্ত্ব—ড. এবনে গোলাম সামাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।

১১। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন—মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, ফার্মা· কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৭৯।

১২। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা—সনৎ মিত্র, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৯, ১৩৮২।

১৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ (২য় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৭৩, ১৯৭৮।

১৪। পশ্চিমবঙ্গ—শচীন্দ্রলাল ঘোষ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী, ১৯৪০।

১৫। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য—উৎস ও অভিপ্রায়—ডঃ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা-৯, ১৯৬৯।
১৬। পরবের আঙিনায়—সরিতা ভৌমিক, ১৯৮২।
১৭। প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক, সাহিত্য-প্রকাশ ভবন, কলিকাতা-৯, ১৯৬২।
১৮। পুজা-পার্ব্বনের উৎসকথা—পল্লব সেনগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯।
১৯। ফোকলোরের স্বরূপ—চিত্ত মণ্ডল, পুস্তক বিপণি, কলি-৯, ১৯৮৩।
২০। বনবিবির উৎস সন্ধানে—সুজিত সুর, বুকমার্ক, কলি-৭৩, ১৩৮৮।
২১। বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, কলিকাতা-৭৩, ১৯৭৭।
২২। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, নয়াদিল্লী, ১৯৮২।
২৩। বাংলা স্বদেশী গান—গীতা চট্টোপাধ্যায়, দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৮৩।
২৪। বাংলার লোক-উৎসব—ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক, ভোলানাথ প্রকাশনী, কলিকাতা-৯, ১৯৬৮।
২৫। বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্র বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা-৯, ১৯৭৮।
২৬। বাংলার লোকসংস্কৃতি—ডঃ ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২, ১৯৭৪।
২৭। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস—ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা-৯, ১৩৮৪।
২৮। বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পাত্র—ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, ১৯৮৪।
২৯। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত ও ভৌগলিক পরিবেশ—হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

৩০। বিবাহের লোকাচার—দীনেন্দ্রকুমার সরকার (সম্পাদিত) পুস্তক বিপণি।

৩১। ভগবানপুর থানার ইতিহাস--প্রবোধচন্দ্র বসু (প্রবন্ধ) ১৯৭৬।

৩২। মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য- পুলকেন্দু সিংহ, সিগমা পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৭৭।

৩৩। লোক-উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, ১৯৮৪।

৩৪। লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ—ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, বুক ট্রাস্ট, কলিকাতা-৯, ১৩৮৭।

৩৫। লোকসঙ্গীত জিজ্ঞাসা -সুকুমার রায়, ফার্মা. কে. এল. প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৮৩।

৩৬। লোকসাহিত্য—ত্রয়োদশ খণ্ড, মংগ্র, সম্পাদনা, বদিউজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

৩৭। ঐ একাদশ খণ্ড।

৩৮। লোকসাহিত্য চতুর্দশ খণ্ড, সঃ আলমগীর জলীল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬।

৩৯। লোকায়ত বাংলা—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৮।

৪০। লোকসাহিত্য—ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ১ম, ২য় খণ্ড, মুক্তধারা ঢাকা, ১৯৭৭, ১৯৮০।

৪১। লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং, কলি-৭৩, ১৩৮৫।

৪২। লোকবিশ্বাস ও সংস্কার—ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা-৯, ১৩৮৭।

৪৩। লোকায়ত ঝাড়খণ্ড—ডঃ বিনয় মাহাত, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা-৭৩, ১৯৮৪।

৪৪। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ—আব্দুল হাফিজ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫।

৪৫। শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত—গুরুসদয় দত্ত, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬।

৪৬। সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি তত্ত্ব—বদরুদ্দীন ওসমান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।
৪৭। সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান—ডঃ কান্তিকচন্দ্র শাসমল ১ম, ২য় খণ্ড, ভারতী পুস্তকালয়, কলিকাতা-৯, ১৩৮৭।
৪৮। সীমান্ত বাংলার লোকযান—সুধীর করণ—এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা-১২, ১৩৭১।
৪৯। হারামণি—ত্রয়োদশ খণ্ড, বিবাহ সঙ্গীত, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৪।
৫০। ক) পত্রিকা—পুর্ণাদ্রি—১০ম বর্ষ, ১৯৮৯, লোকধর্ম সংকলন।
খ) বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি—শারদ সংকলন, ১৩৮৯।

ইংরাজী বই :

1. Encyclopaedia of the Social Sciences.
2. Totem and tabu—Sigmud Freud.
3. An Introduction to Anthroplogy—Ralph Beals and Harry Hoijer.
4. North Carolina Folk lore -Ed. Newman lyey whit.
5. In which Bound Africa—F. H. Melland.
6. The life of South African Tribe—H. A. Junod.
7. The Lodhas of West Bengal—Dr. P. K. Bhowmik.
8. Folk—Tales of Bengal—The Rev. Lal Behari Dey.